৫

গবেষণা নক্‌শা
Research Design

গবেষণার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে চলকগুলোর সংজ্ঞায়ন, পরিমাপ ও প্রয়োজনবোধে অনুকল্প নির্মিত হবার পর গবেষককে গবেষণা নক্‌শা গঠন করতে হয়, যা মূলতঃ গবেষণা সম্পর্কিত কতগুলো মৌলিক প্রশ্নের সমাধান দেয়। যেমন, গবেষক কাদের উপর গবেষণা করবেন? কতজনের উপর করবেন? কি পর্যবেক্ষণ করবেন? কখন পর্যবেক্ষণ করবেন? কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করবেন? ইত্যাদি। অন্য কথায়, গবেষণা নক্‌শা হলো গবেষণা কর্ম বাস্তবায়নের একটি প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বা নীল-নক্‌শা। গবেষণা নক্‌শা প্রধানতঃ তিন ধরণের হয়ে থাকে — অনুসন্ধানমূলক, বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক। এই গবেষণা নক্‌শাগুলোর তিনটি মৌলিক প্রায়োগিক পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো কেস্-স্টাডি, জরিপ ও পরীক্ষণ। অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণা নক্‌শায় কেস-স্টাডি ও জরিপকে ব্যবহার করা হয় এবং ব্যাখ্যামূলক গবেষণা নক্‌শায় জরিপ ও পরীক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়। এই তিনটি মৌলিক গবেষণা নক্‌শা সামাজিক বিজ্ঞানের সকল ধরণের সমস্যাকে অধ্যয়নের জন্য পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। সে কারণে সামাজিক বিজ্ঞানীরা আরো কিছু গবেষণা নক্‌শা উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলো মৌলিক গবেষণা নক্‌শা নয়। এর প্রতিটিই কোন না কোনভাবে মৌলিক গবেষণা নক্‌শাগুলোর ভিন্ন ধরণ। গবেষক কোন ধরণের গবেষণা নক্‌শা ব্যবহার করবেন তা নির্ভর করে সমস্যার প্রকৃতি, গবেষণার উদ্দেশ্য ও ধরণসহ অর্থ, সময়, জনবল, ইত্যাদির উপর।

এই ইউনিটে আমরা যে পাঠগুলো অধ্যয়ন করবো, সেগুলো হলো:

- পাঠ - ১ : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
- পাঠ - ২ : অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণা নক্‌শা – কেস স্টাডি ও জরিপ
- পাঠ - ৩ : ব্যাখ্যামূলক গবেষণা নক্‌শা – জরিপ ও পরীক্ষণ
- পাঠ - ৪ : অন্যান্য গবেষণা নক্‌শা

পাঠ - ১

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
Definition and Types

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- গবেষণা নক্শা কী
- একটি উত্তম গবেষণা নক্শার বৈশিষ্ট্য
- গবেষণা নক্শার কার্যাবলী
- গবেষণা নক্শার উপাদান
- গবেষণা নক্শার প্রকারভেদ

গবেষণা নক্শা কী (What is Research Design)?

সামাজিক বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণার বহু বিষয় রয়েছে। যে কোন সামাজিক পরিবেশ, পারিপার্শিকতা বা বিষয়বস্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হতে পারে। সাম্প্রতিককালে, বহু বৈচিত্রপূর্ণ সামাজিক সমস্যা বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা সত্ত্বেও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা এক ধরণের গবেষণা পরিকল্পনার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এই গবেষণা পরিকল্পনাকে প্রথাগতভাবে গবেষণা নক্শা বলে অভিহিত করা হয়। যখন গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়ে যায়, অনুকল্পগুলোকে ব্যাখ্যা করে চলকগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে যায়, তখন গবেষক যে সমস্যাটির সম্মুখীন হন তা হলো গবেষণা নক্শাটি গঠন করা, যার মাধ্যমে গবেষক তার অনুকল্পগুলোকে পরীক্ষা করবেন। কিন্তু অনুকল্প পরীক্ষা করতে গিয়ে গবেষক কিছু মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হন যেগুলোর সমাধান অবশ্যই প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে হতে হবে। সেই সমস্যাগুলো হলো: আমরা কাদের উপর গবেষণা পরিচালনা করবো? কি পর্যবেক্ষণ করবো? কতজনের উপর করবো? কখন পর্যবেক্ষণ করা হবে? কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে? ইত্যাদি। গবেষণা নক্শা হলো এমন একটি নীল-নক্শা, যা গবেষককে এই সমস্যগুলো সমাধানের পথ বাতলে দেয়। অর্থাৎ, গবেষণা নক্শা হলো গবেষণা কর্মের একটি প্রস্তাবিত কর্মসূচী যা গবেষককে উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত চলকসূহের মধ্যে বিদ্যমান কার্য-কারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

গবেষণা নক্শা হলো গবেষণা বাস্ড়বায়নের একটি যৌক্তিক ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা।

গবেষণা নক্শা হলো গবেষণা বাস্তবায়নের একটি যৌক্তিক ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা। আরো সহজ করে বলা যায় যে, গবেষণা নক্শা হলো গবেষণা বাস্তবায়নের একটি যৌক্তিক ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা। বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আদর্শের মধ্য থেকে গবেষণা নক্শার জন্ম হয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি গবেষককে গবেষণাধীন সমস্যার পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়িকরণের নিয়মকে নির্দেশ করে। গবেষণা নক্শা সাধারণীকরণের ক্ষেত্রও নির্ধারণ করে। গবেষণায় প্রাপ্ত ব্যাখ্যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে, না কি ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। তবে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, গবেষণা নক্শা একটি রূপরেখা মাত্র এবং গবেষণা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে এর পরিবর্তন ঘটতে পারে। একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে গবেষণা নক্শা গঠন করা উচিৎ। অর্থাৎ, ক্রমপরম্পরার ধারাবাহিকতায় যখন গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিষয়বস্তুকে গবেষণাযোগ্য সমস্যায় রূপান্তর করা হয়, গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়, প্রত্যয়গুলো সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে যায় এবং অনুকল্পগুলো কার্যকরভাবে নির্মিত হয়ে যায়, তখনই কেবলমাত্র গবেষণা নক্শা গঠন করা উচিৎ।

কোন প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের আগে এটি কেন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করাকে গবেষণা নক্শা বলা যায়। যেমন, বাংলাদেশের মাতৃস্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে গবেষণার জন্য সর্বাগ্রে

বুঝে নিতে হবে ঠিক কোন বিষয়টি সম্পর্কে গবেষক জানতে চান? মাতৃস্বাস্থ্য সেবা বলতে তিনি এই গবেষণায় কি বোঝাতে চান? কোন বয়সী মায়েদের সম্পর্কে জানতে চান? মাতৃজীবনের কোন সময়ের প্রতি তিনি জোর দিতে চান? গবেষককে এও ঠিক করে নিতে হবে যে, আসলে তিনি কি উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালনা করছেন। মাতৃস্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাবার জন্য, না কি মাতৃস্বাস্থ্য সেবার প্রতিবন্ধকতাকে বোঝার জন্য, না কি এর পেছনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বিশ্লেষণের জন্য? গবেষণা নক্শা প্রণয়নের মাধ্যমে আমরা এ সব প্রশ্নেরই সমাধান খুঁজি।

একটি উত্তম গবেষণা নক্শার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Good Research Design)

একটি উত্তম গবেষণা নক্শার কমপক্ষে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হলো বস্তুনিষ্ঠতা। গবেষণার ফলাফলের বস্তুনিষ্ঠতা উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি এবং উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত। একটি উত্তম গবেষণা নক্শা পরিমাপের বস্তুনিষ্ঠ হাতিয়ার ব্যবহারকে নিশ্চিত করে যার মাধ্যমে সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব হয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো নির্ভরযোগ্যতা। আমরা জানি যে, নির্ভরযোগ্যতা হলো প্রতিটি পরিমাপের ক্ষেত্রে পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল প্রাপ্তির নিশ্চিতি। অর্থাৎ, উত্তরদাতা কোন বিশেষ দফায় প্রথমে যে উত্তর দেবেন, পরবর্তীতে যতবার তাকে সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হবে ততবার তার কাছ থেকে একই রকম উত্তর পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করা। অতএব, গবেষক তার প্রশ্নের দফাগুলোকে এমনভাবে সাজাবেন যাতে করে উত্তরদাতা কেবল প্রত্যাশিত উত্তরটিই দিতে পারেন। গবেষণা নক্শার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো যথার্থতা। গবেষণা নক্শা এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিৎ যাতে করে নির্ভরযোগ্য ফলাফলের পাশাপাশি যথার্থও হতে হবে। অর্থাৎ, পরিকল্পনাটি এমন হতে হবে যেন, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারটি দিয়ে যা পরিমাপ করতে চাওয়া হয়েছে ঠিক তাই পরিমাপ করা যায়। যেমন, শ্রেণী কাঠামো পরিমাপের জন্য যে সূচকগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো যেন শ্রেণী কাঠামোকেই বিনির্মাণ করে, অন্য কিছু নয়। চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি হলো সাধারণীকরণের যোগ্যতা। একটি সুপরিকল্পিত গবেষণা নক্শা এমন ফলাফলকে সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি সাধারণীকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, একটি গবেষণা নক্শা তখনই উত্তম বলে পরিগণিত হবে যখন নক্শার অধীনে নির্মিত পরিমাপের হাতিয়ারটি বস্তুনিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ উপাত্তের জন্ম দেবে; গবেষণা সমগ্রকটি দ্ব্যর্থহীনভাবে সংজ্ঞায়িত হবে; নমুনা নির্বাচনের যথাযথ কৌশল ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা থেকে উপাত্ত সংগৃহীত হবে; উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য যথাযথ পরিসংখ্যনগত কৌশল ব্যবহৃত হবে; এবং পরিমাপের ভ্রান্তি, নমুনা ভ্রান্তি বা অন্য কোন উপাদানের দ্বারা দুষ্ট না হয়ে গবেষণার ফলাফলকে সাধারণীকরণযোগ্য করে তুলবে।

গবেষণা নক্শার কার্যাবলী (Functions of Research Design)

একটি গবেষণা নক্শা কি কি কার্য সম্পাদন করবে, তা প্রধানতঃ নির্ভর করে গবেষণা নক্শাটি কতটুকু পরিশীলিত তার উপর।

একজন গবেষক যে ধরণের গবেষণা নক্শাই নির্বাচন করুন না কেন প্রতিটি পরিকল্পনাই এক বা একাধিক কার্যাবলী সম্পাদন করে। একটি গবেষণা নক্শা কি কি কার্য সম্পাদন করবে, তা প্রধানতঃ নির্ভর করে গবেষণা নক্শাটি কতটুকু পরিশীলিত তার উপর। গবেষণা নক্শার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যকে পার্যলোচনা করলে দেখা যায় যে, এটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। *প্রথমতঃ*, গবেষণা নক্শা গবেষককে সামাজিক সমস্যাবলী গবেষণার জন্য একটি নীল-নক্শা প্রদান করে। একটি নীল-নক্শা ছাড়া যেমন একটি বাড়ি নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি একটি পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া গবেষণা শুরু করলে তা অনেক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। অতএব, গবেষণা কর্ম বাস্তবায়ন শুরুর পূর্বে বেশ কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যেমন, গবেষণাটি কি সম্পর্কিত? গবেষণা প্রশ্নের সমাধানে কি ধরণের উপাত্ত প্রয়োজন হবে? প্রয়োজনীয় উপাত্ত কোথায় পাওয়া যাবে? কোথায় বা কোন এলাকায় গবেষণাটি পরিচালিত হবে? গবেষণা পরিচালনার সময়কাল কতটুকু হবে? প্রয়োজনীয় উপাত্ত

সংগ্রহের জন্য কি পরিমাণ নমুনা প্রয়োজন হবে? নমুনা নির্বাচনের ভিত্তিটি কি হবে? উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কি কৌশল ব্যবহার করা হবে? উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য কি কৌশল গ্রহণ করা হবে? ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, গবেষণা নক্শা গবেষণা কর্মের সীমারেখা নির্ধারণ করে গবেষককে তার সমগ্র শক্তি একটি সুনির্দিষ্ট দিকে চালিত করতে সক্ষম করে তোলে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, উদ্দেশ্যহীন গবেষণা একটি সমাপ্তিহীন অনুশীলনে পরিণত হয়। একটি গবেষণা নক্শায় সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে গবেষক তার লক্ষ্য অর্জনের পথে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যেতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, গবেষণা নক্শা গবেষককে তার গবেষণা কার্য বাস্তবায়নে অনেক সমস্যাকে পূর্বেই অনুমান করতে সহায়তা করে। এটি সম্ভব হয় যথাযথ গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে। এই পর্যালোচনায় গবেষক সমস্যাটিকে সমাধানের বিভিন্ন বিকল্প পথের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনাসহ গবেষণার ব্যয়, পরিমাপ সমস্যা এবং বিদ্যমান সম্পদ ও জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।

গবেষণা নক্শার কতগুলো সুবিধা রয়েছে। *প্রথমতঃ*, গবেষণা নক্শার ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করলে প্রত্যাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত উপসংহারে পৌঁছতে সহজ হয়। *দ্বিতীয়তঃ*, গবেষণা নক্শা ভ্রান্তির পরিমাণকে হ্রাস করে অধিকতর নির্ভুল ফল পেতে সাহায্য করে। *তৃতীয়তঃ*, এটি গবেষণাকে অধিকতর কার্যকর করে তোলে এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। *চতুর্থতঃ*, এটি সময় ও অর্থের অপচয়কে কমাতে সাহায্য করে। *পঞ্চমতঃ*, গবেষণা নক্শা উপাত্ত সংগ্রহ ও অনুকল্প পরীক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করে। *ষষ্ঠতঃ*, গবেষণা নক্শা গবেষণাকে সঠিক পথে পরিচালনার একটি অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে কাজ করে।

গবেষণা নক্শার উপাদান (Components of Research Design)

একটি গবেষণা নক্শার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। যদিও এই উপাদানগুলোর অধিকাংশই গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত এবং এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, একটি দ্রুত উপস্থিত ধারণা পাবার জন্য এগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

গবেষণার শিরোনাম (Title of the Study): গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করতে চান সে বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট একটি শিরোনাম থাকতে হবে। তবে শিরোনামটিকে যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্টভাবে সূক্ষ্ম হতে হবে। শিরোনামের মধ্যে গবেষণা সমস্যার পরিধিকে প্রতিফলিত হতে হবে।

গবেষণা সমস্যার বর্ণনা (Statement of the Problem): এই পর্যায়ে, গবেষক তার সমস্যাটিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন। বলা হয়ে থাকে যে, একটি সমস্যার যথাযথ বর্ণনা করতে পারলে সমস্যাটির অর্ধেক সমাধান হয়ে যায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গবেষণা সমস্যা বর্ণনার সময় ভাষা ব্যবহারের রীতিকে স্পষ্ট, সহজ ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে।

গবেষণা সাহিত্যের পর্যালোচনা (Review of Research Literature): গবেষণা সাহিত্যের পর্যালোচনা হলো গবেষণা সমস্যার উপর পূর্বে পরিচালিত গবেষণাসমূহের একটি জরিপ। এই জরিপের উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান জ্ঞানের মধ্যে যে শূন্যতা রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করা। পর্যালোচনাটি এমনভাবে করা উচিৎ যাতে করে গবেষণা সমাপ্ত হবার পর প্রাপ্ত ফলাফল গবেষণাধীন বিষয়বস্তুর উপর মৌলিক অবদান রাখতে পারে এবং চিহ্নিত শূন্যতাগুলো পূরণে সহায়তা করে।

গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিধির বিবরণ (Delineation of Area and Scope of the Study): যেহেতু প্রতিটি গবেষণাই বিভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন হয়ে থাকে। সেটি হতে পারে ভৌগলিক সীমারেখার দিক থেকে,

বা সময়ের দিক থেকে, বা কার্যকারীতার দিক থেকে। অতএব, এই পর্যায়ে গবেষণাটি কাদের নিয়ে, কোথায়, কি উদ্দেশ্যে এবং কত সময় ধরে পরিচালিত হবে তার বিশদ বর্ণনা করতে হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study): প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমে গবেষক যে সকল প্রশ্নের সমাধান খোঁজেন সেই গবেষণা প্রশ্নগুলোই গবেষণার উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণিত হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করতে হবে।

অনুকল্প নির্মাণ (Formulation of Hypothesis): অনুকল্প হলো গবেষণা সমস্যার পরীক্ষামূলক সমাধানের প্রস্তাবনা। অনুকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অনুকল্পগুলো যেন প্রত্যয়গতভাবে স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট এবং অভিজ্ঞতালব্ধভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত হয়। নাস্তি অনুকল্প ও বিকল্প অনুকল্পকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে হবে।

প্রত্যয়ের সংজ্ঞা (Definition of Concepts): একজন গবেষককে তার গবেষণায় ব্যবহৃত প্রতিটি পদের অর্থকে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে। প্রত্যয়ের তত্ত্বগত সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে সেগুলোকে তত্ত্ব ও অন্যান্য প্রত্যয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। কার্যকর সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে প্রত্যয়কে বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করতে হবে যা গবেষণা পরিচালনা ও উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণে সাহায্য করবে।

পদ্ধতি (Methodology): এই পর্যায়ে অনুসন্ধানের পদ্ধতি কি হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গবেষণাটি কি প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ হবে, না কি অন্যান্য উৎসে প্রকাশিত মাধ্যমিক উপাত্ত ব্যবহার করে বিশ্লেষণধর্মী হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র জনগোষ্ঠী থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে, না কি নমুনায়নের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে।

নমুনা নক্শা (Sampling Design): সামাজিক গবেষণায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন করা হয়। নমুনায়ন পদ্ধতিটি কি সম্ভাবনামূলক হবে, না কি নিঃসম্ভাবনামূলক হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নমুনায়ন পদ্ধতির সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ, যে সমগ্রক থেকে নমুনায়ন করা হবে সেই সমগ্রককে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, নমুনার আকার এবং নমুনা চয়নের পদ্ধতির বর্ণনা করতে হবে। তৃতীয়তঃ, নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতার বিষয়টি যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ (Constructing Data Collection Instrument): উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের ধরণটি কেমন হবে তা নির্ভর করে উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ও গবেষণার প্রকৃতির উপর। যদি গবেষণাটি একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোভিত্তিক হয়, সে ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের প্রকৃতি এক রকম হবে, আবার যদি তা ঢিলেঢালাভাবে পরিচালিত হয় তবে তা ভিন্ন হবে। প্রশ্নগুলো কি উন্মুক্ত থাকবে, না কি বন্ধ প্রকৃতির হবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ প্রশ্ন গঠনে শব্দ চয়ন, প্রশ্নের বিষয় নির্বাচন, প্রশ্নের ক্রম, ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রশ্নমালা কি উত্তরদাতার কাছে ডাকযোগে প্রেরিত হবে, না কি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মাধ্যমে মুখোমুখি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে এ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর একটি যথাযথ উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণ করতে হবে।

উপাত্ত সংগ্রহ ও মাঠ ব্যবস্থাপনা (Data Collection and Field Management): উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের পর যে কাজটি বাকি থাকে সেটি হলো উত্তরদাতার কাছ থেকে সুসমন্বিতভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করে নিয়ে আসা। এই পর্যায়ে, উপাত্ত সংগ্রহকারীদের নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ পর্যায়ে কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে এবং কিভাবে তার তত্ত্বাবধান করা হবে এ

সকল বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা খুব সতর্কতার সাথে গবেষণা নক্শায় বিবৃত থাকতে হবে।

উপাত্তের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা (Analysis and Interpretation of Data): উপাত্ত সংগ্রহের পর উপাত্তরাশিকে বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে উপাত্তের যথার্থতা যাচাই, সম্পাদনা ও সঠিকতা নির্ধারণ করতে হবে। উপাত্তের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কি কি বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। কি কি পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং সাধারণীকরণের কোন মাত্রায় উপসংহার টানা হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। বিশ্লেষিত উপাত্তের ব্যাখ্যাকে পূর্ববর্তী গবেষণা, সাধারণীকরণের বৃহত্তর ক্ষেত্র, গবেষণার উদ্দেশ্য, এবং নতুন কিছু উপাদান যা পূর্বে গবেষকের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে নি এ সব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করতে হবে।

প্রতিবেদন উপস্থাপন (Presentation of the Report): অনুসন্ধানকারী গবেষককে অবশ্যই তার গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে একটি প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে হবে। এখানে শুধু উপাত্তের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়, পরিচালিত গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য গবেষকের জন্য ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনাও গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রতিবেদনে কি কি বিষয় এবং কিভাবে উপস্থাপিত হবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকতে হবে।

সময়-সূচী ও বাজেট (Time-Schedule and Budget): পুরো গবেষণার কর্ম শেষ হতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হবে তার একটি বিষদ সময়-সূচী তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি, গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তার পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, তা যেন বাস্তবসম্মত হয়। কারণ, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা বেশ প্রতিযোগিতাপূর্ণ। যদি বাজেট যুক্তিসঙ্গত না হয় তবে প্রত্যাশিত অর্থের জোগান পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

গবেষণা নক্শার প্রকারভেদ (Types of Research Design)

গবেষণা নক্শা প্রধানতঃ তিন ধরণের হয়ে থাকে — অনুসন্ধানমূলক, বর্ণনামূলক ও পরীক্ষামূলক।

গবেষণা নক্শা প্রধানতঃ তিন ধরণের হয়ে থাকে — অনুসন্ধানমূলক, বর্ণনামূলক ও পরীক্ষামূলক। এই তিন ধরণের গবেষণা নক্শা সামাজিক গবেষণার চারটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করে। *প্রথমতঃ*, একটি অজানা বা স্বল্প পরিচিত প্রপঞ্চ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া, অথবা সেই প্রপঞ্চটি সম্পর্কে একটি নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া। *দ্বিতীয়তঃ*, কোন ব্যক্তি, বস্তু, অবস্থা বা দলের বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্যসমূহকে বর্ণনা করা এবং কোন কিছু ঘটবার মাত্রাকে নির্ধারণ করা। *তৃতীয়তঃ*, চলকসমূহের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা । চতুর্থতঃ, দুটি চলকের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্দেশক অনুকল্প যাচাই করা। কোন গবেষণা নক্শা একটি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নির্মিত হয়, আবার কোন কোন গবেষণা একাধিক উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে গবেষণার এই চার ধরণের উদ্দেশ্যকে সবসময়ই সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করা যায় না। বরং অনেক গবেষণায়ই আলোচিত উদ্দেশ্যগুলোর দুটি বা তিনটি একসাথে বিবেচ্য হতে পারে।

অনুসন্ধানমূলক গবেষণা নক্শা (Exploratory Research Design): সামাজিক বিজ্ঞানগুলো বিজ্ঞান হিসাবে বেশ তরুণ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুলনায় এগুলোর মধ্যে উচ্চ মাত্রায় গবেষণা পদ্ধতির তেমন বিকাশ ঘটেনি। এমন কি সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো কখনো খুব সাধারণ অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার জন্য কখনো খুব বেশী সুনির্দিষ্ট। সামাজিক গবেষণার এই সংকটের মুখে প্রকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ধারণা অর্জনের জন্য অথবা কোন প্রপঞ্চ সম্পর্কে আরো সুনির্দিষ্টভাবে জানার জন্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় যে, অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত পরিস্থিতি বা সমস্যা সম্পর্কে গবেষকের কোন ধারণা থাকে না, বা যৎসামান্য ধারণা থাকে। বিশেষ একটি গোষ্ঠী বা কোন গবেষণা সমস্যার সাথে সাধারণ পরিচিতি গবেষককে সেই সমস্যার গভীরে যেতে সাহায্য করে না।

অনুসন্ধানমূলক গবেষণা অজানা বা স্বল্প পরিচিত প্রপঞ্চকে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য পরিচালিত হয়, যা পরবর্তীতে আরো পরিশীলিত গবেষণা নক্শা গঠনে সাহায্য করে।

ধরা যাক, একজন গবেষক বাংলাদেশে বয়স্ক মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বয়স্কদের উপযোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টির সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে গবেষণা করতে চান। কিন্তু দেখা গেল যে, গবেষকের এ সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই। এ ক্ষেত্রে, একজন গবেষক এই নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবার জন্য, কিংবা পরবর্তীতে এর উপর আরো সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন। সেই গবেষণার মাধ্যমে তিনি জেনে নিতে পারেন যে, উদ্যোগটির প্রেক্ষাপট কি ছিলো? কোন বয়সী বয়স্ক লোকদের এই কর্মসংস্থান উদ্যোগের আওতায় আনা হয়েছে? কর্মসংস্থানের ধরণটি কেমন? প্রাথমিকভাবে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর কি পরিমাণ এই উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? কিংবা এই উদ্যোগ সম্পর্কে সমাজের মানুষের প্রতিক্রিয়া কি? এ রকম নানাবিধ জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তিনি এ সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারেন যা তাকে পরবর্তী গবেষণা পরিচালনার নক্শা নির্ধারণে, কিংবা প্রকল্প প্রণয়নে সাহায্য করবে। যেখানে কোন গবেষক গবেষণার কোন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চান, সেখানেই অনুসন্ধানমূলক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এই গবেষণার বড় সমস্যাটি হলো যে, গবেষণা প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক জবাব প্রায়ই পাওয়া যায় না। তবে সন্তোষজনক বা সূক্ষ্ম জবাব খোঁজার একটি যোগসূত্র অনুসন্ধানমূলক গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

বর্ণনামূলক গবেষণা নক্শা (Descriptive Research Design): অনুসন্ধান ছাড়াও কোন ঘটনা বা প্রপঞ্চের মধ্যে বিভিন্ন নৈমিত্তিক সম্পর্কসমূহের বর্ণনা করা সামাজিক গবেষণা নক্শার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। গবেষক কোন জনগোষ্ঠী বা তার অংশের জাতিগত ভিত্তি, তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাগত অবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক সংগঠনগুলোর কাঠামো ও কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারেন। আবার একটি চলকের সাথে অন্য চলকের সম্পর্কের মাত্রা, সম্পর্কের ধরণ, কোন চলকের বিন্যাস, ঘটনার মাত্রা, ইত্যাদি বিষয়ও তিনি তার বর্ণনায় তুলে আনতে পারেন। এ ধরণের গবেষণায় কোন ঘটনা সম্পর্কে অনুমান নির্ভর তথ্যও প্রদান করা হয়। যেমন, আগামী নির্বাচনে কতজন ক্ষমতাসীন দলকে ভোট দেবেন? কিংবা আগামী দশকের শুরুতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিন্যাস কেমন হবে? কিংবা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আগামী দশকে কতটুকু বৃদ্ধি পাবে, ইত্যাদি। সামাজিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ গবেষণাই বর্ণনামূলক প্রকৃতির হয়ে থাকে।

অনুসন্ধানমূলক গবেষণার তুলনায় বর্ণনামূলক গবেষণা নক্শা অধিকতর সুনির্দিষ্ট। এই গবেষণাগুলো গবেষণা সমস্যার বিশেষ বিষয়ের প্রতি বা কোন প্রপঞ্চের বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ এবং বিদ্যমান সম্পর্কগুলো বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কোন ঘটনা কিভাবে সংঘটিত হয় সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বর্ণনামূলক গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হলো যে, বর্ণনামূলক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য অনুকল্প প্রণীত হলেও গবেষণার শুরুতে কোন অনুকল্প নির্মাণ করা হয় না। অর্থাৎ, বর্ণনামূলক গবেষণায় কোন কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা করা হয় না। যেমন, শিক্ষার সাথে আয়ের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্ণয় করা গেলেও শিক্ষা আয়কে প্রভাবিত করে, না কি আয় শিক্ষাকে প্রভাবিত করে তা নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি নির্ণয় করতে হলে ব্যাখ্যামূলক গবেষণা নক্শার মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজন হয়।

ব্যাখ্যামূলক গবেষণা নক্শা (Explanatory Research Design): সফলতার সাথে গবেষণা সমাপ্ত করার জন্য গবেষণা সমস্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সুস্পষ্ট গবেষণার উদ্দেশ্য এবং যথাযথ গবেষণা নক্শা গবেষককে একটি সুবিধাজনক ভিত্তি প্রদান করে। গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণা নক্শা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সমস্যার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকবে। অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্যটি হলো সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে এমন প্রপঞ্চ, ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধানের মাধ্যমে

স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা। এগুলো কোন বিষয় সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় এবং কখনো কখনো পরবর্তী অনুসন্ধানের দিক নির্দেশনা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার বিষয়বস্তু সরবরাহের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

কোন ঘটনার অনুসন্ধান ও বর্ণনার পর গবেষকের জন্য আরেকটি কাজ বাকী থেকে যায়, তা হলো গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্ধারিত চলকগুলোর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা। ব্যাখ্যামূলক গবেষণা সম্পাদনের মাধ্যমে গবেষক এই উদ্দেশ্য পূরণ করেন। ব্যাখ্যামূলক গবেষণা নক্শার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো একটি নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে এক বা একাধিক চলকের (নির্ভরশীল চলক) উপর অপর এক বা একাধিক চলকের (স্বাধীন চলক) সম্ভাব্য প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে, প্রভাব বিস্তারকারী ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলককে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেহেতু অধিকাংশ সামাজিক কার্যাবলী এবং মানব আচরণের মধ্যে বহুবিধ চলকের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন রয়েছে, সেহেতু ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অপ্রাসঙ্গিক চলকের (extraneous variables) প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গবেষক প্রাসঙ্গিক চলকগুলোর নীট প্রভাবকে (net effects) নির্ণয় করেন। গবেষক তার গবেষণায় যত বেশী চলককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, নির্ভরশীল চলকের উপর স্বাধীন চলকের প্রভাব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতা তত বেশী বৃদ্ধি পাবে।

ব্যাখ্যামূলক অনুসন্ধানগুলো সাধারণীকরণের জন্ম দেয় বা কমপক্ষে সাধারণীকরণের দিকে এগিয়ে নেয়। এ ধরণের গবেষণায় চলকগুলোর মধ্যে সম্পর্কগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকে, যার ফলে তাদের মধ্যে কার্য-কারণ উপসংহারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। গবেষণা পরিচালনার পূর্বেই এই সম্পর্কগুলো অনুকল্পের আকারে অনুমান করতে হয়। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভালো অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক অনুসন্ধান ছাড়া ভালো ব্যাখ্যামূলক গবেষণা করা যায় না। অন্য কথায়, একটি ভালো ব্যাখ্যামূলক গবেষণার পূর্ব শর্ত হলো একটি ভালো বর্ণনামূলক অনুসন্ধান পরিচালনা করা।

সামাজিক বিজ্ঞানে বিদ্যমান গবেষণা নক্শার বিভিন্ন প্রায়োগিক পদ্ধতিগুলো এই তিন ধরণের অনুসন্ধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে, গবেষণার নক্শার তিনটি মৌলিক প্রায়োগিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. কেস্-স্টাডি (Case-Study),
২. জরিপ (Survey), এবং
৩. পরীক্ষণ (Experiment)।

গবেষণা সাহিত্যে গবেষণা নক্শার অন্যান্য যে প্রায়োগিক পদ্ধতিগুলো লক্ষ্য করা যায় সেগুলো এই তিনটি মৌলিক পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। কেস স্টাডির প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হলো একটি ঘটনা, বিষয় বা বস্তুকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। অর্থাৎ, বিশ্লেষণের একক হলো একটি। সেটি একজন ব্যক্তি হতে পারে, একটি প্রতিষ্ঠান হতে পারে, একটি গোষ্ঠী হতে পারে, একটি সম্প্রদায় হতে পারে, এমন কি একটি জাতিও হতে পারে। জরিপমূলক গবেষণা নক্শায় তীব্রতার মাত্রাটি কিছুটা কম থাকে, কিন্তু এটি অনেক বেশী গবেষণা এককের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে, পরীক্ষণ গবেষকের দ্বারা বিভিন্ন চলকের নিপুণ ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে কেস-স্টাডি ও জরিপ পদ্ধতি এবং ব্যাখ্যামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে জরিপ ও পরীক্ষণ পদ্ধতির বিভিন্ন প্রকরণ ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী পাঠগুলোতে গবেষণা নক্শার এই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

সারাংশ

যে কোন কাজ শুরু করার পূর্বে যেমন একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রেও তাই গবেষণা শুরু করার পূর্বে একটি পরিকল্পনার প্রযোজন হয়। এই পরিকল্পনাটিই হলো গবেষণা নক্শায়। একটি উত্তম গবেষণা নক্শা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন, সমস্যার

ধরণ, গবেষণার ক্ষেত্র, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সময়সূচী, গবেষণার স্থান, অর্থের যোগান, ইত্যাদি। গবেষণা নক্শার বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভর করে গবেষণাটি কিভাবে পরিচালিত হবে। বর্তমান পাঠে গবেষণা নক্শার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও, গবেষণা নক্শার উপাদান ও প্রকারভেদ নিয়েও বর্তমান পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তম গবেষণা নক্শাই গবেষককে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে গবেষণা পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। গবেষণা নক্শা হলো:

ক. গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহ পরিকল্পনা
খ. গবেষণার জন্য স্থান নির্ধারণ
গ. গবেষণা বাস্তবায়নের সময়সূচী
ঘ. গবেষণা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা।

২। একটি উত্তম গবেষণা নক্শার কমপক্ষে _____ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

ক. ২ টি
খ. ৪ টি
গ. ৬ টি
ঘ. ৮ টি

৩। গবেষণা নক্শা প্রধানতঃ _____ ধরণের হয়ে থাকে।

ক. এক
খ. দুই
গ. তিন
ঘ. চার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গবেষণা নক্শা কী?

২। গবেষণা নক্শা কয় প্রকারের হয়ে থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গবেষণায় গবেষণা নক্শার প্রয়োজনীয়তা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। একটি উত্তম গবেষণা নক্শার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণা নক্শা – কেস-স্টাডি ও জরিপ
Exploratory & Descriptive Research Design – Case Study & Survey

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- কেস-স্টাডি কী
- কেস-স্টাডির সুবিধা ও অসুবিধা
- জরিপ কী
- জরিপের সুবিধা ও অসুবিধা
- বর্ণনামূলক জরিপের বিভিন্ন ধরণ

কেস স্টাডি কী (What is Case Study)?

আমরা জানি যে, গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকম গবেষণা নক্শা তৈরি হয়। যেমন, কোন অজানা প্রপঞ্চ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ কিংবা সেটি সম্পর্কে নতুন কোন ধারণা পাওয়া যদি গবেষণার উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা অনুসন্ধানমূলক গবেষণা নক্শা অনুসরণ করি। আবার কোন ব্যক্তি, কোন ঘটনা বা দলের বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য আমরা বর্ণনামূলক গবেষণা পরিচালনা করি। অথবা কোন ঘটনা কতবার ঘটছে বা কতবার অন্য কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে তা বর্ণনা করা যদি গবেষণার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা বর্ণনামূলক গবেষণা পরিচালনা করি। যদি বিভিন্ন প্রপঞ্চের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের কার্য-কারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে আমরা ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পরিচালনা করি। ব্যবহারিক দিক থেকে গবেষণা নক্শার এসব বিভিন্নতা খুব সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত নয়। কারণ, একটি গবেষণার মধ্যে বিভিন্ন গবেষণা নক্শার উপাদান থাকতে পারে। অনুসন্ধানমূলক গবেষণায় গবেষণাধীন প্রপঞ্চ সম্পর্কে গভীর ও প্রগাঢ় ধারণা পাওয়ার জন্য, কিংবা সেটিকে আরো সুনির্দিষ্ট গবেষণার পথে এগিয়ে নিতে কেস-ষ্টাডি পদ্ধতির ব্যবহার কার্যকরী ফলাফল দিয়ে থাকে।

একটি সামাজিক এককের পুরো জীবন চক্রের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি হলো কেস-স্টাডি।

সামাজিক গবেষণায় কেস-স্টাডি একটি জনপ্রিয় গবেষণা নক্শা। সাধারণভাবে, বিশ্লেষণের কোন একটি একক বা একটি ঘটনা সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান বা নির্বাচিত কিছু তথ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার পুরো বা আংশিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা হলো কেস স্টাডি। বিশ্লেষণের এই একক হতে পারে একজন ব্যক্তি, একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সংগঠন, একটি গোষ্ঠী, বা একটি জাতি। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, কেস-স্টাডি হলো একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর একটি ব্যাপক এবং নিবিড় গবেষণার পদ্ধতি, যা গবেষককে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যতবেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিভাবে সমাজের একটি একক হিসাবে কাজ করে তা বুঝতে সাহায্য করে। কেস-স্টাডি নকশায়, একটি বিষয়কে অখন্ড রূপে সর্বাত্মক অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রয়াস গ্রহণ করা হয়, যেখানে গবেষক তার সব দক্ষতা, প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ, একটি সামাজিক এককের পুরো জীবন চক্রের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি হলো কেস-স্টাডি।

এই পদ্ধতি একটি প্রদত্ত সামাজিক অবস্থায় বিভিন্ন উপাদানের একটি সর্বাত্মক বর্ণনা ও বিশ্লেষণকে প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন, সম্প্রদায় গবেষণার ক্ষেত্রে, গবেষক সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে জানবেন; এর ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক এবং সামাজিক কাঠামো ও গঠন সম্পর্কে জানবেন; তিনি সামজিক শ্রেণী কাঠামোর মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি প্রাধান্য পায়, কারা ক্ষমতাবান এবং কারা সমাজের কোন স্তরে রয়েছেন তা জানার চেষ্টা করবেন। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, গবেষক যতদূর সম্ভব একটি সর্বাত্মক বর্ণনা দেবার চেষ্টা করবেন এবং এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে একটি যৌক্তিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, কেস-স্টাডি সাধারণতঃ একটি বা খুব কম সংখ্যক ঘটনার মধ্যে সীমিত

থাকে, সংখ্যা ও ধরণের দিক থেকে ব্যাপক সংখ্যক চলকের উপর কেন্দ্রীভূত থাকে, এবং আগ্রহটি থাকে গভীর ও সর্বাত্মক অনুসন্ধানের। সামাজিক গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতির সাথে কেস-স্টাডির তফাৎটি হলো যে, যেখানে অধিকাংশ গবেষণা সাধারণীকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, সেখানে কেস-স্টাডি একটি ঘটনাকে উপলব্ধির চেষ্টা করে মাত্র। অন্যান্য গবেষণা নক্শায় গবেষক গবেষণাধীন চলকের সংখ্যাকে সীমিত রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু কেস-স্টাডিতে তা যত বেশী সম্ভব বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। গবেষক যখন কেস-স্টাডি পরিচালনা করেন তখন তিনি একটি ঘটনা সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাওয়ার চেষ্টা করেন, যা একটি ঘটনার অতিরিক্ত পরিস্থিতিতে সাধারণীকরণের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু কেস স্টাডির ফলাফল নিজে থেকে কোন সাধারণীকরণের জন্ম দিতে পারে না।

কেস স্টাডি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে সকল কেস-স্টাডি পরিচালিত হয় সেগুলো সাধারণতঃ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মনোবিশ্লেষণ বা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার সাথে জড়িত। যেমন, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণগত গবেষণা। তবে সমাজ কর্ম, আইন, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিভিত্তিক কেস-স্টাডি পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন, দারিদ্র, আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ইত্যাদি সম্পর্কিত গবেষণা। গোষ্ঠীভিত্তিক গবেষণাগুলো বেশীর ভাগ পরিচালিত হয়েছে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, আদিবাসী, কৃষক সম্প্রদায়, গ্রাম গবেষণা, কিশোর অপরাধ, মাদকাশক্তি, শ্রমিক সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে। কেস-স্টাডি গবেষণা নক্শায় বিভিন্ন ধরণের উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। এই কৌশলগুলোর পরিধি এত বিস্তৃত যে, তা পর্যবেক্ষণগত অনুসন্ধান থেকে মাধ্যমিক উপাত্তের বিশ্লেষণ পর্যন্ত হতে পারে। কেস স্টাডির উপাদানের উৎস হতে পারে ব্যক্তিগত দলিল (চিঠি-পত্র, ডায়েরী, জীবনবৃত্তান্ত, ইত্যাদি), অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের বিবরণী, অথবা অন্যদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন, ইত্যাদি।

কেস স্টাডির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Case Studies)

কেস-স্টাডির সবচেয়ে বড় সুবিধাটি হলো, উপাত্ত সংগ্রহের কৌশলের ক্ষেত্রে এর নমনীয় নীতিমালা।

কেস স্টাডি একজন গবেষককে তার অভিজ্ঞতার এমন উদাহরণ নির্বাচন করতে সুযোগ করে দেয় যার মাধ্যমে তিনি যা প্রতিষ্ঠা করতে চান তার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়। অন্য কথায়, এই গবেষণা নক্শা পদ্ধতির মাধ্যমে জীবনের সকল পর্যায়ের বিশদ বিবরণ দেয়া সম্ভব হয়। কেস-স্টাডির সবচেয়ে বড় সুবিধাটি হলো, উপাত্ত সংগ্রহের কৌশলের ক্ষেত্রে এর নমনীয় নীতিমালা। এতে একাধারে বহু কৌশল প্রয়োগ করা যায়। বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণের জন্য অনানুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ থেকে কঠোর কাঠামোভিত্তিক সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। এতে একটি বা একাধিক কৌশল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয় সুবিধাটি হলো যে, কৌশলের নমনীয়তা থাকার ফলে গবেষণাকে বিভিন্ন মাত্রায় পরিচালনা করা সম্ভব হয়। তৃতীয় সুবিধাটি হলো যে, এই গবেষণা নক্শা ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন সামাজিক পটভূমিতে গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হয়। তবে গবেষণার পটভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণা উপাদানের সহজলভ্যতা, সময়, জনবল ও প্রয়োজনীয় অর্থ-প্রাপ্তি বিশেষ প্রভাব ফেলে। কেস স্টাডির চতুর্থ সুবিধাটি হলো, যদি গবেষক একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেন, তবে সেই তাত্ত্বিক কাঠামোর একটি বা দু'টি বিষয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি তাৎক্ষণিক সুযোগ কেস স্টাডির মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব হয়। তবে সেটি অবশ্য নির্ভর করে অনুসন্ধানের মাত্রা এবং উপাত্ত সংগ্রহের কৌশলের উপর।

কেস-স্টাডির সবচেয়ে বড় অসুবিধাটি হলো এর সাধারণীকরণের সীমাবদ্ধতা।

সুবিধার পাশাপাশি, কেস-স্টাডির কিছু অসুবিধাও রয়েছে। কেস-স্টাডির সবচেয়ে বড় অসুবিধাটি হলো এর সাধারণীকরণের সীমাবদ্ধতা। যেহেতু বিশ্লেষণের একক হলো একটি (সেটি ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যাই হোক না কেন), সেহেতু গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও কেস-স্টাডির ফলাফল সমগ্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো, যেহেতু কেস স্টাডিতে একটি গবেষণা এককের উপর গভীর বিশ্লেষণ করা হয়, সেহেতু গবেষকের হাতে প্রচুর সময়, জনবল ও অর্থ থাকে না বলে একই বিষয়ের উপর একাধিক কেস স্টাডি করা সম্ভব হয় না। ফলে, প্রত্যাশিত উপসংহারমূলক সাধারণীকরণ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয় সমস্যাটি হলো, যেহেতু বিশ্লেষণের একক একটি এবং সেই বিষয়ের অনেক

গভীরে যেতে হয়, সেহেতু আপাতঃদৃষ্টিতে কেস স্টাডিকে স্বল্প ব্যয়সম্পন্ন গবেষণা নক্শা মনে হলেও তা মূলতঃ বেশ ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। কেস স্টাডি পরিচালনা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে হয় বলে গবেষণা সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এই পদ্ধতিতে গবেষকের ব্যক্তিগত আগ্রহ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ ও মনোভাব গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করে। শুধুমাত্র একটি ঘটনাকে নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয় বলে উত্তরদাতা যদি কোন কারণে ভুল তথ্য প্রদান করেন তবে সম্পূর্ণ গবেষণাটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

জরিপ কী (What is Survey)?

অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণা নক্শার প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রকরণ হিসাবে কেস-স্টাডি কোন ব্যক্তি, ঘটনা বা গোষ্ঠী সম্পর্কে গভীর ও প্রগাঢ় অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই অন্তর্দৃষ্টিমূলক বিশ্লেষণে একটি ঘটনা, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন সম্ভব হলেও সেই উদ্ঘাটিত বিষয়বস্তুকে অন্য একটি ঘটনা, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ, কেস-স্টাডিতে বিশ্লেষণের একক থাকে একটি। ফলে একটি সমগ্রকের অধীনস্থ উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস ও নৈমিত্তিকতার বিশ্লেষণ করা যায় না। সে জন্য বর্ণনামূলক গবেষণা নক্শার আরেকটি প্রকরণ অনুসরণ করা প্রয়োজন। সেটি হলো জরিপ গবেষণা নক্শা। জরিপ গবেষণা সম্ভবতঃ সামাজিক বিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত একটি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। কারণ, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধমে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বর্ণনার লক্ষ্যে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করতে আগ্রহী সামাজিক বিজ্ঞানীদের কাছে জরিপ গবেষণা একটি সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

'জরিপ' শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হলো প্রশ্নমালা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বা টেলিফোন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা তার অংশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। জরিপ হলো গবেষণা নক্শার এমন একটি বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রায়োগিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে যে কোন সামাজিক প্রপঞ্চের উপর নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাওয়ার জন্য, বা প্রশাসনিক কাজে কিছু সাধারণ তথ্য সংগ্রহের জন্য, বা বাজার ও মতামত জরিপের জন্য, বা সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের বর্ণনা ও কার্য-কারণ ব্যাখ্যার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হয়। জরিপ গবেষণা সাহিত্যের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মানব আচরণের খুব কম বিষয় রয়েছে যা সামাজিক জরিপের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে সামাজিক জরিপের বিষয়বস্তুর পরিধি এত বিস্তৃত যে, তার পুরো তালিকা উপস্থাপন করা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে সেগুলোকে কতগুলো বৃহত্তর দফায় শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন, একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জনবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য (পরিবারের গঠন, বৈবাহিক মর্যাদা, জন্মশীলতা, বয়স, ইত্যাদি), তাদের সামাজিক পরিবেশ (শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়, সামাজিক সুযোগ সুবিধা, জীবন যাত্রা, ইত্যাদি), বিভিন্ন কর্মকান্ড (অবসর যাপন, ভ্রমণের অভ্যাস, ব্যয়ের রূপসহ বিভিন্ন আচরণ), এবং মতামত ও মনোভাব।

জরিপ হলো গবেষণা নক্শার এমন একটি বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রায়োগিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে যে কোন সামাজিক প্রপঞ্চের উপর নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাওয়ার জন্য, বা প্রশাসনিক কাজে কিছু সাধারণ তথ্য সংগ্রহের জন্য, বা বাজার ও মতামত জরিপের জন্য, বা সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের বর্ণনা ও কার্য-কারণ ব্যাখ্যার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

বর্ণনামূলক জরিপ গবেষণা নক্শা প্রয়োগের বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন, সরকার আমদানী রফতানী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য জনসাধারণ কি কি ধরণের ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করতে পছন্দ করে সে বিষয়ে জানতে আগ্রহী হতে পারে, অথবা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার পণ্য বাজারজাত করার জন্য ভোক্তাদের পছন্দের ধরণটি জানতে চায়, অথবা একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যবিত্ত মানুষ বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে কি কি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে চায় সে বিষয়ে জানতে চাইতে পারে। এই উদাহরণগুলো থেকে দেখা যায় যে, জরিপ গবেষণা সুস্পষ্টভাবে কতগুলো বর্ণনামূলক উদ্দেশ্যকে কার্যকর করে। সামাজিক অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ গবেষণায় একজন সামাজিক বিজ্ঞানীর কাছে জরিপ নক্শা বর্ণনার একটি বিশুদ্ধ হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হয়।

জরিপ গবেষণা নক্শায় কয়েকটি ঘটনা থেকে শুরু করে একটি সমগ্রকের সব উপাদানকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যখন একটি সমগ্রকের পুরোটিকে জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়,

তখন সেই জরিপটিকে পূর্ণ শুমার (complete enumeration) বলে। পূর্ণ শুমার জাতীয় জরিপে অনুসন্ধানের প্রকৃতিটি খুব সহজ সরল থাকে। আদমশুমারী হলো এ ধরণের একটি জরিপ। কিন্তু যখন সমগ্রকের একটি অংশকে নিয়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়, তখন সেটিকে নমুনা জরিপ বলে। একটি আদর্শ নমুনা জরিপে, গবেষক গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত সমগ্রক থেকে একটি নমুনা নির্বাচন করেন এবং সেই নির্বাচিত নমুনার উপর একটি প্রশ্নমালা প্রয়োগ করে উপাত্ত সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ, আমরা সমগ্রক থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করি এবং তারপর গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করে সে সকল নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। এ ধরণের নমুনা জরিপের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, শ্রেণী, ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করতে পারি।

জরিপ পদ্ধতিতে শুধু ব্যক্তিই যে গবেষণার একক হিসাবে বিবেচিত হয় তা নয়, কোন এলাকা, দল, গোষ্ঠী, পরিবার, শহর, রাষ্ট্র, জাতি, ক্লাব, সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, বা সংগঠনও গবেষণার একক হতে পারে। অনেক সময় আমরা নমুনা একক হিসাবে ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ না করে বরং কোন দল বা গোষ্ঠীকে বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। বিভিন্ন সংগঠনের কাঠামো বা কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা সংগঠনের কোন একজন ব্যক্তি নয়, বরং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংগঠনটি সম্পর্কে ধারণা নেই। যেমন, বাংলাদেশে নগর বিকাশের উপর গবেষণা করতে গিয়ে গবেষক দেশের বিভিন্ন শহরকে নমুনার একক হিসাবে বিবেচনা করেন এবং নগর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। এটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও উত্তরদাতা বা তথ্য প্রদানকারী হিসাবে ব্যক্তি মানুষকে নির্বাচন করা হয়। একটি ঘটনা (যেমন, বিবাহ বিচ্ছেদ) বা সামাজিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের (যেমন, সরকারী ও বেসকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বা ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী) উপর জরিপ পরিচালনা করতে চাইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে এমন ব্যক্তি, নির্বাচিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আদিবাসী সম্প্রদায় বিশ্লেষণের একক হিসাবে বিবেচিত হলেও তথ্য প্রদানকারী হিসাবে যে কোন ব্যক্তি মানুষকে নির্বাচন করতে হয়।

নমুনা জরিপ অনেক জটিলতর একটি বর্ণনামূলক অনুসন্ধান হতে পারে। অনুসন্ধানের জটিলতার মাত্রার উপর নির্ভর করবে বিশ্লেষণের একক বা নমুনার সংখ্যা কি হবে তা। অনুসন্ধানটি যদি অনেক বেশী সংখ্যক চলক নিয়ে গভীরতর হয়, তবে নমুনা সংখ্যা কম হবে, এবং যদি অধিকতর কম সংখ্যক চলকসম্পন্ন হয়, তবে নমুনা সংখ্যা অনেক বেশী হতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন বিশ্লেষণের একক বা ঘটনার সংখ্যা বেশী হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধানের গভীরতা হ্রাস পায় এবং বিশ্লেষণযোগ্য চলকের সংখ্যা কমে যায়। স্বল্প সংখ্যক নমুনা নিয়ে প্রগাঢ় জরিপ গবেষণা কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেও গবেষক এর মাধ্যমে বৃহত্তর সাধারণ চিত্রটি তার দৃশ্যপটে ধরতে ব্যর্থ হন। যেমন, একজন গবেষক যদি পারিবারিক জীবনের নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে চান, সে ক্ষেত্রে তিনি অল্প কিছু পরিবারের মধ্যে তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন এবং প্রগাঢ় ও গভীর অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারেন। এই গবেষণার ফলাফল থেকে হয়তো গবেষণাধীন স্বল্প সংখ্যক পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছু বিশদভাবে জানা যাবে, কিন্তু সেই ফলাফলগুলো অন্যান্য পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। কারণ, হয়তো দেখা যাবে যে, অন্যান্য অনেক পরিবারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো গবেষণাধীন পরিবারগুলোর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে না। অতএব, জরিপ গবেষণা নক্শা পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য ও নমুনার আকারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জরিপের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Survey)

জরিপের প্রধান সুবিধাটি হলো, এটির মাধ্যমে বহু ঘটনাকে নিয়ে অনুসন্ধানমূলক, বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পরিচালনা করা যায়।

জরিপের *প্রধান* সুবিধাটি হলো, এটির মাধ্যমে বহু ঘটনাকে নিয়ে অনুসন্ধানমূলক, বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পরিচালনা করা যায়। *দ্বিতীয়তঃ*, গবেষণাধীন সমস্যার উপর উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রশ্নমালায় প্রশ্নগুলো এমনভাবে রচিত হয়, যাতে করে ব্যক্তির কাছ থেকে আহরিত উত্তরগুলো নমুনায় নির্বাচিত সব উপাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। *তৃতীয়তঃ*, নমুনার নির্বাচন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনায়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। *চতুর্থতঃ*, প্রশ্ন

নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি সাধারণতঃ পক্ষপাতিত্বমুক্ত থাকে। *পঞ্চমতঃ*, জরিপকে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি করা যায়। *ষষ্টতঃ*, জরিপে উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা যায়।

জরিপ গবেষণার (বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক যাই হোক না কেন) উপযোগিতা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, সামাজিক বিজ্ঞানীরা জরিপ গবেষণায় অতি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

জরিপ গবেষণার (বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক যাই হোক না কেন) উপযোগিতা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, সামাজিক বিজ্ঞানীরা জরিপ গবেষণায় অতি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এ ধরণের সমালোচনার পিছনে জরিপের নিজস্ব পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। *প্রথমতঃ*, অবিবেচনাপ্রসূত জরিপ পরিচালনার ফলে অর্থ, সম্পদ ও সময়ের অপচয় এবং অপ্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ। *দ্বিতীয়তঃ*, বিভিন্ন জটিল সামাজিক সমস্যার গবেষণায় (যেখানে অন্য কোন পদ্ধতির ব্যবহার যথাযথ হতে পারে) জরিপ পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ। *তৃতীয়তঃ*, জরিপ গবেষণার পরিমাণগত বিশ্লেষণের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুণগত উপাদানের ক্ষেত্রে নির্বিচার প্রয়োগ। *চতুর্থতঃ*, জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত সারণি, লেখচিত্র এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয় বলে সেগুলো প্রায়শঃ বৃহত্তর তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। *পঞ্চমতঃ*, উপাত্ত কতগুলো বিষয়ের সার-সংক্ষেপ হিসাবে উপস্থাপিত হয় বলে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া ও পরিবর্তনগুলো উপলব্ধির মধ্যে আসে না। *ষষ্ঠতঃ*, উত্তরদাতা প্রশ্নগুলো প্রথমে যেভাবে বোঝেন, সেগুলো তিনি উত্তর দেবার সময় সঠিকভাবে বুঝে উত্তর দেন কিনা তা প্রমাণের কোন সুযোগ থাকে না। ফলে, উত্তরের সত্যতা ও সঠিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।

বর্ণনামূলক জরিপ নক্শার বিভিন্ন ধরণ (Different Types of Descriptive Survey Design)

জরিপ গবেষণা নক্শার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। এই গবেষণা নক্শার ধরণগুলো অনুসন্ধানমূলক, বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক তিনটি ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু আমরা জানি যে, এই তিন ধরণের গবেষণা নক্শার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর মধ্যে সম্পর্কের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করা হয়, কিন্তু গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোন অনুকল্প প্রণয়ন করা হয় না। বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন চলকের সম্পর্কগুলোকে বর্ণনা করা হয় মাত্র, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করা হয় না। তবে, বর্ণনামূলক জরিপ নক্শায়, প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য অনুকল্প প্রণয়ণ করা হয়। ব্যাখ্যামূলক জরিপে গবেষণা কার্যক্রমটি শুরু হয় অনুকল্প পরীক্ষার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। জরিপ গবেষণা নক্শার ব্যাখ্যামূলক ধরণগুলো পরবর্তী পাঠে আলোচনা করা হবে। এই পাঠে বর্ণনামূলক গবেষণায় ব্যবহৃত হয় এমন জরিপ নক্শাগুলো আলোচনা করা হবে।

ক্রস-সেক্শনাল জরিপ (Cross-Sectional Survey): ক্রস-সেক্শনাল জরিপে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, মনোভাব ও মতামত বর্ণনার লক্ষ্যে নির্বাচিত নমুনা থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সেই উপাত্তের ভিত্তিতে সমগ্রকটিকে বর্ণনা করা হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে, ক্রস-সেক্শনাল জরিপে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ ধরণের জরিপে সাধারণতঃ একটি বৃহৎ আকারের নমুনা নির্বাচন করা হয় এবং ডাকযোগে প্রশ্নমালা প্রেরণ করে বা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বা টেলিফোন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সেই নমুনা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। বৃহৎ আকারের নমুনা ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহার এ ধরণের জরিপকে সামাজিক বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ উপযোগী করে তুলেছে, বিশেষ করে কোন বিষয়ের উপর তুলনামূলকভাবে সঠিক ও দ্রুততার সাথে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য।

দীর্ঘকালীন জরিপ (Longitudinal Survey): যেহেতু সময়ের সাথে যে কোন বিষয় বা জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে থাকে, সেহেতু ক্রস-সেক্শনাল জরিপের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্পর্কে কোন উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। পরিবর্তন বা কোন প্রক্রিয়ার বিকাশ সম্পর্কে জানতে হলে একের অধিক সময়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কখনো দু'টি সময়ে, আবার কখনো তিনটি বা চারটি সময়ে

জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ ধরণের জরিপকে দীর্ঘকালীন জরিপ বলে। দীর্ঘকালীন জরিপ কয়েকভাবে পরিচালনা করা যায়। যেমন,

১. ধারা গবেষণা (trend studies),
২. কোহর্ট গবেষণা (cohort studies), এবং
৩. প্যানেল গবেষণা (panel studies)।

ধারা গবেষণায়, একটি সাধারণ সমগ্রক থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যদিও আদর্শ পরিস্থিতিতে একই উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রত্যাশা করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সময়ে উত্তরদাতা বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন, তবে তাদেরকে অবশ্যই একই সমগ্রকের প্রতিনিধি হতে হবে। এ ক্ষেত্রে, একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধারা গবেষণায় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় একজন গবেষকের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে, গবেষক গবেষণাধীন বিষয়ের উপর অন্য সময়ে অন্য গবেষক কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। ধারা গবেষণার ক্ষেত্রে, প্রথম সময়ের গবেষণায় যে ব্যক্তি তথ্য দিয়েছেন, দ্বিতীয় সময়ের গবেষণায় তিনি জীবিত নাও থাকতে পারেন। আবার প্রথম গবেষণায় যার জন্ম হয়নি, দ্বিতীয় গবেষণায় তিনি নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

কোহর্ট গবেষণায়, একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে উপাত্ত সংগৃহীত হয়। কোহর্ট বলতে কোন একটি সময়ে সংগঠিত কোন ঘটনার যারা অংশীদার তাদেরকে বোঝায়। যেমন, যারা ১৯৭১ সালে জন্ম নিয়েছে তারা ঐ বছরে জন্মগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর কোহর্ট। যারা ২০০০ সালে এস এস সি পাশ করেছে তারা ঐ বছরে এস. এস. সি পাশ করা জনগোষ্ঠীর কোহর্ট। কোহর্ট গবেষণায় এরকম একটি কোহর্ট থেকে বিভিন্ন সময়ে উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। ধারা গবেষণার সাথে কোহর্ট গবেষণার একটি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। সেটি হলো, ধারা গবেষণার মত কোহর্ট গবেষণায়ও কোহর্টভুক্ত একই জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য আহরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, দু'টি ভিন্ন সময়ে একই কোহর্টের একই ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নয়, বরং একই কোহর্টের ভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ধারা এবং কোহর্ট গবেষণা উভয়েরই একটি সাধারণ অসুবিধা রয়েছে। যেমন, ধারা গবেষণায় নির্বাচনী প্রচারণাকালীন বিভিন্ন সময়ে ভোটারদের আচরণের উপর পরিচালিত গবেষণায় তাদের পরিবর্তনশীল আচরণ বর্ণনা করা হয়। কিন্তু পূর্বের কোন উত্তরদাতা পরবর্তীতে পরিবর্তিত আচরণ প্রকাশ করেছেন কি না তা ধারা গবেষণায় জানা যায় না। দীর্ঘকালীন গবেষণায় এই অসুবিধা দূর করার জন্য প্যানেল গবেষণা করা হয়। এতে বিভিন্ন সময়ে একই নমুনা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এই গবেষণায় গবেষণাধীন নমুনাকে প্যানেল বলা হয়। যেমন, নির্বাচনী প্রচারণাকালীন বিভিন্ন সময়ে যদি একই নমুনার একই ব্যক্তির কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, তবে কোন ব্যক্তি প্রথম থেকে পরবর্তী সময়ে ভিন্ন উত্তর দিচ্ছেন তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তবে ধারা বা কোহর্ট গবেষণায় যেমন পূর্বে অন্য কোন গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের মাধ্যমিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, প্যানেল গবেষণায় তা সম্ভব হয় না। প্যানেল গবেষণা সাধারণতঃ অর্থ ও সময়ের দিক থেকে বেশী ব্যয়বহুল হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় দফায় নমুনায় নির্বাচিত উত্তরদাতাগণ অনেক ক্ষেত্রে গবেষণায় অংশগ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ ছাড়াও, প্যানেল গবেষণায় সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ পদ্ধতি বেশ কিছুটা জটিল হয়ে থাকে।

সারাংশ

গবেষণার ফলাফলের মান নির্ভর করে যথাযথ গবেষণা নক্শার উপর। এই পাঠে গবেষণা নক্শার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ — কেস-স্টাডি ও জরিপ — আলোচনা করা হয়েছে। কেস-স্টাডি নির্ভর গবেষণা নক্শায় কোন প্রপঞ্চ সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়। অন্যদিকে, বর্ণনা নির্ভর গবেষণা নক্শায় প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সাধারণ রূপ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

উভয় ক্ষেত্রেই, কোন নক্শাটি যথাযথ ফল দিবে তা নির্ভর করে গবেষণা সমস্যার প্রকৃতির উপর। গবেষককে গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিয়ে গবেষণা নক্শা প্রণয়নে মনোনিবেশ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর নিবিড় গবেষণাকে:

ক. জপির গবেষণা বলে
খ. পর্যবেক্ষণ গবেষণা বলে
গ. কেস-স্টাডি বলে
ঘ. উপরের সব।

২। কেস-স্টাডির সবচেয়ে বড় অসুবিধাটি হলো:

ক. গবেষণা পরিচালনায় অর্থ বেশী লাগে
খ. গবেষণা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে
গ. গবেষণায় সাধারণীকরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে
ঘ. গবেষণায় অনেক বেশী চলক নিয়ে কাজ করতে হয়।

৩। কোহর্ট গবেষণা:

ক. একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে উপাত্ত সংগৃহীত হয়
খ. একই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপাত্ত সংগৃহীত হয়
গ. একটি দলের কাছ থেকে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপাত্ত সংগৃহীত হয়
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জরিপ কী?

২। কেস-স্টাডি কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সমাজ গবেষণায় কেস-স্টাডির গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা করুন?

২। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি জানার জন্য পরিচালিত গবেষণায় আপনি কোন কৌশলটি অধীক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

পাঠ - ৩

ব্যাখ্যামূলক গবেষণা নক্‌শা – জরিপ ও পরীক্ষণ
Explanatory Research Design – Survey and Experiment

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্‌শা কী
- ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্‌শার প্রকারভেদ
- পরীক্ষণ কী
- পরীক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা
- নমুনা নির্বাচনের পদ্ধতি
- পরীক্ষণের প্রকারভেদ
- পরীক্ষণমূলক নক্‌শার প্রকারভেদ

ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্‌শা কী (What is Explanatory Survey Design)?

সামাজিক প্রপঞ্চ, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা, ইত্যাদির মধ্যে বিদ্যমান নৈমিত্তিক সম্পর্কসমূহের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত জরিপকে ব্যাখ্যমূলক জরিপ গবেষণা নক্‌শা বলে।

সামাজিক বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক জরিপ গবেষণার মাধ্যমে বহু সামাজিক প্রপঞ্চ ও প্রতিষ্ঠানকে বর্ণনা করেছেন। যেমন, পরিবারের বিভিন্ন ধরণ ও গঠন প্রণালীর সাথে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক, শিক্ষার সাথে সামাজিক গতিশীলতার সম্পর্ক, ইত্যাদি। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, জরিপের উদ্দেশ্য সবসময় বর্ণনা করা নয়। বহু জরিপ পরিচালিত হয়েছে এ সকল সম্পর্ককে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্‌শায় সাধারণতঃ অনুকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে দু'টি চলকের মধ্যে অনুমিত সম্পর্কের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়। বর্ণনামূলক জরিপে দু'টি চলকের মধ্যে শুধুমাত্র সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়, অথচ ব্যাখ্যামূলক জরিপে বর্ণনার পাশাপাশি সম্পর্কের কারণ খুঁজে বের করা হয়। এ ধরণের গবেষণা নক্‌শায় সাধারণতঃ কোন একটি বা একাধিক চলককে নির্ভরশীল এবং অপর কোন একটি বা একাধিক চলককে স্বাধীন চলক হিসাবে বিবেচনা করে তাদের মধ্যেকার কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। এ সকল ব্যাখ্যা কখনো তত্ত্বগত হয়ে থাকে, আবার কখনো ব্যবহারিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ হয়ে থাকে। অনুসন্ধান ও বর্ণনামূলক জরিপ নক্‌শায় গবেষক স্বাধীন চলককে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাপক ব্যবহার করেন না, বা গবেষণাধীন বিষয়কে নিয়ন্ত্রণমূলক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেন না। একমাত্র ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্‌শায় তা করা হয় অনুকল্প পরীক্ষার মাধ্যমে। অতএব, সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, সামাজিক প্রপঞ্চ, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা, ইত্যাদির মধ্যে বিদ্যমান নৈমিত্তিক সম্পর্কসমূহের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত জরিপকে ব্যাখ্যামূলক জরিপ গবেষণা নক্‌শা বলে।

ব্যাখ্যামূলক গবেষণা নক্‌শা বাস্তবায়নের পূর্বে গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে একজন গবেষক অনুকল্প প্রণয়ন করেন যে, একটি স্বাধীন চলক একটি নির্ভরশীল চলকের মধ্যে পরিবর্তনের জন্য কারণ হিসাবে কাজ করে। অনুকল্প পরীক্ষার জন্য গবেষক নির্বাচিত নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ভরশীল চলকের উপর স্বাধীন চলকের প্রত্যাশিত প্রভাবের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নির্ভরশীল চলকের মধ্যে পরিবর্তনের পিছনে স্বাধীন চলকটি কি একমাত্র কারণ হিসাবে কাজ করে? যদি নির্ভরশীল চলককে আর অন্য কোন চলক প্রভাবিত না করে থাকে তখনই কেবল বলা যায় যে, সেই স্বাধীন চলকটি নির্ভরশীল চলকের মধ্যে পর্যবেক্ষণকৃত পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হতে পারে। কিন্তু এমন হতে পারে যে, স্বাধীন চলকটি হয়তো নির্ভরশীল চলকটির সাথে কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়। সম্ভবতঃ, স্বাধীন চলকটি কেবলমাত্র আংশিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং অবশিষ্ট পরিবর্তনটি ঘটেছে অন্যান্য চলকের কারণে (যা কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় নি)।

এই সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ধারণ করতে হলে কোন না কোনভাবে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রয়োজনীয় চলকের প্রভাবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণের দু'টি উপায় রয়েছে। প্রথমটি হলো, পরিসংখ্যানগত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে। যেমন, বহুধা নির্ভরণ বিশ্লেষণের (multiple regression analysis) মাধ্যমে অন্যান্য চলকের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট স্বাধীন চলকের নীট প্রভাব নির্ণয় করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি হলো, সম্পূর্ণ নমুনাকে পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দলে বিভক্ত করে পরীক্ষণ দলের উপর স্বাধীন চলকটিকে প্রয়োগ করার পর দুই দলের মধ্যেকার পার্থক্যকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। এই আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিভিন্ন চলকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের প্রকৃত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 'নিয়ন্ত্রণ'-এর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, আলোচনার গভীরে যাওয়ার পূর্বে 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটির অর্থ অনুধাবন করা উচিৎ।

সামাজিক গবেষণায় 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটির বহুবিধ অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। এক অর্থে, 'নিয়ন্ত্রণ'-এর অর্থ হলো কিছু চলককে ভিন্নতা প্রদর্শনের স্বাধীনতা প্রদান করে এক বা একাধিক উপাদানকে স্থির রাখা। যেমন, যদি মনে করা হয় যে, একটি পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে 'লিঙ্গ' একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সে ক্ষেত্রে, 'লিঙ্গ' চলকটিকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি পরীক্ষণমূলক উদ্দীপকের (stimulus) উপর নারী ও পুরুষের প্রতিক্রিয়াগত ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। সেই উদ্দীপক চলকটি হতে পারে কোন ঔষধের মাত্রা, বা একটি সামাজিক অবস্থা, বা শিক্ষার মাত্রা, ইত্যাদি। একইভাবে, বয়সকেও একটি নিয়ন্ত্রিত চলক বলে গণ্য করা যেতে পারে। অন্য অর্থে, 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটিকে একটি সামাজিক গোষ্ঠী বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা পরীক্ষণের জন্য উন্মুক্ত থাকে না। যেমন, যদি আমরা একটি দলের উপর একটি ঔষধের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই এবং অন্য একটি দলের উপর সেই ঔষধ প্রয়োগ করতে না চাই, তবে যে দলটিকে ঔষধ দেয়া হচ্ছে সেই দলটিকে পরীক্ষণ দল এবং যে দলটিকে ঔষধ দেয়া হচ্ছে না সেই দলটিকে নিয়ন্ত্রিত দল বলে গণ্য করা হয়। কখনও কখনও একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে থাকেন। এমনটি হয় বিশেষ করে 'পূর্বে এবং পরে' ধরণের গবেষণা নক্শার ক্ষেত্রে। যেমন, একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি উদ্দীপক গ্রহণের পূর্বে তার আচরণকে পরিমাপ করা হয় এবং কিছু সময়ের ব্যাবধানে সেই ব্যক্তির একই আচরণের দ্বিতীয় পরিমাপ গ্রহণ করা হয়। উদ্দীপকটির প্রভাবের মাত্রা নির্ধারণের জন্য এই দুই সময়ের আচরণকে তুলনা করা হয়। প্রথম পরিমাপ থেকে দ্বিতীয় পরিমাপের ব্যবধান কতটুকু হবে সেটি নির্ভর করে গবেষকের লক্ষ্য, গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরীক্ষণের ধরণের উপর।

ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্শার প্রকারভেদ (Types of Explanatory Survey Design)

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, ব্যাখ্যামূলক গবেষণা নক্শার দু'টি প্রধান শর্ত হলো অনুকল্প পরীক্ষা এবং পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ। ব্যাখ্যামূলক জরিপের বিন্যাস ও কার্যক্রমের ধরণটি অনেকটা বর্ণনামূলক নক্শার মতো, তবে উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্শা প্রণয়নের শুরুতে *প্রথমতঃ*, একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে কিছু অনুকল্প পরীক্ষার প্রস্তাবনা করতে হয়, এবং *দ্বিতীয়তঃ*, প্রয়োজনবোধে নমুনাকে পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দলে বিভক্ত করতে হয়। প্রয়োজনবোধে বলা হয়েছে এ কারণে যে, কোন কোন জরিপ নক্শায় অনুকল্প পরীক্ষা করা হলেও নমুনাকে পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ দলে বিভক্ত করা হয় না। ব্যাখ্যামূলক জরিপে সাধারণতঃ, দু'ধরণের নক্শা ব্যবহৃত হয়ে থাকে — ব্যাখ্যামূলক ক্রস-সেক্শনাল জরিপ ও ক্রস-সোসাইটাল জরিপ নক্শা।

ব্যাখ্যামূলক ক্রস-সেক্শনাল জরিপ নক্শা (Explanatory Cross-Sectional Survey Design): সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হলো ব্যাখ্যামূলক ক্রস-সেক্শনাল জরিপ। এটিকে 'স্থিতিশীল দল তুলনা' (static group comparison) নক্শাও বলা হয়ে থাকে। ধরা যাক, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'ধরণের পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একটি আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি, যেখানে হাতে কলমে এবং অন্যটি গতানুগতিক সনাতন পদ্ধতি, যেখানে বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। এই দু'ধরণের পাঠদান পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে একজন গবেষক একটি গবেষণা করতে চান। এই গবেষণায় তিনি যে অনুকল্পটি পরীক্ষা করবেন সেটি

হলো, 'যে সব ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদানের জন্য আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সে সব ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল, যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের গতানুগতিক পদ্ধতিতে পড়ানো হয় তাদের ফলাফলের চেয়ে ভালো হবে'।

এই অনুকল্প পরীক্ষার জন্য আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা গতানুগতিক কৌশলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে ভালো ফলাফল করেছে কি না, বা কতটুকু ভালো করেছে তা আধুনিক পদ্ধতি শুরুর পূর্বের ও পরবর্তী পরীক্ষার ফলাফলের পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করলে জানা যাবে। যদি পার্থক্যটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশী হয়, তবে পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের কার্যকরী প্রভাব সম্পর্কে গবেষক একটি ইতিবাচক উপসংহার টানতে পারেন। এ ক্ষেত্রে, গবেষক আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে এমন কিছু বিদ্যালয়কে পরীক্ষণ দল এবং গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করে এমন কিছু বিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রিত দলের নমুনা হিসাবে নির্বাচন করতে পারেন। তারপর, এই দু'ধরণের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে গবেষক আধুনিক পাঠদান পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে উপসংহার টানতে পারেন।

কিন্তু এ ধরণের কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে, যদি পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দল দু'টি গঠন করার সময় বিদ্যালয়গুলো দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা না হয়, তবে পাঠদান পদ্ধতির অভিজ্ঞতার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্য সমরূপ ছিলো কি না তা বলা যায় না। সমরূপতা পরিমাপের এই অভাবটিকে পুষিয়ে নেবার জন্য গবেষককে গবেষণার পরে সমকক্ষতার মানদন্ডকে পূরণের লক্ষ্যে নমুনার জোড়া মিলিয়ে নিতে হয়। পরীক্ষণের তুলনায় ব্যাখ্যামূলক ক্রস-সেক্শনাল জরিপের কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও এর কিছু সুবিধা রয়েছে। ব্যাখ্যামূলক নক্শায় নমুনার ভিত্তিতে দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিক প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা পাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ফলে, এই গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গবেষক ব্যাপকতর সমগ্রক সম্পর্কে উপসংহার টানতে পারেন। এটি একটি বাস্তব পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় বলে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফুর্ততা অনেক বেশী থাকে এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল দিয়ে প্রকৃত জীবনের অবস্থা সম্পর্কে গবেষক অনেক বেশী গভীর অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন।

ক্রস-সোসাইটাল জরিপ নক্শা (Cross-Societal Survey Design): ক্রস-সোসাইটাল জরিপে সাধারণতঃ কমপক্ষে দু'টি সমাজের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। প্রকৃতির দিক থেকে এটিও একটি ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্শা। কারণ, এ গবেষণায় অন্তর্নিহিতভাবে হোক বা প্রকাশ্যে হোক, ন্যুনতম দু'টি চলকের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ধরণের গবেষণা নক্শা সাধারণতঃ দু'ধরণের সম্পর্ক বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত হয়। *প্রথমতঃ*, এমন সম্পর্ক যেখানে অনুমিত কার্য-কারণমূলক উপাদানটি গবেষণাধীন সমাজেরই একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিদ্যমান থাকে। *দ্বিতীয়তঃ*, এমন সম্পর্ক যা গবেষক অন্য সমাজের ক্ষেত্রে হয় পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আরেকবার বিশ্লেষণ করতে চান, নতুবা সাধারণীকরণ করতে চান।

প্রথম ধরণের গবেষণায় বিভিন্ন সমাজ থেকে নির্বাচিত নমুনার মধ্যে তুলনা করা হয়। যেহেতু গবেষণা বাস্তবায়নের সময় নমুনার ধরণ ও উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার একই ধরণের হয়ে থাকে, সেহেতু এই পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও যথার্থতাসম্পন্ন উপাত্তের জন্ম দেয়। তবে এ ধরণের গবেষণায় গবেষক ভাষাগত ভিন্নতার কারণে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের অর্থের সমতা নিরূপণে সমস্যার সম্মুখীন হন। যখন গবেষক উপাত্তের উপর এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ রাখতে অসমর্থ হন, তখন তিনি সাধারণতঃ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সমাজের উপর পূর্বে পরিচালিত অন্যান্য জরিপ বা আদমশুমারীকে উপাত্তের উৎস হিসাবে বিবেচনা করেন। এটি তখন দ্বিতীয় ধরণের ক্রস-সোসাইটাল গবেষণার রূপ নেয়। এ ক্ষেত্রে, আমরা একটি সমাজে ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে গ্রহণ করি এবং তা অন্য একটি সমাজের সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করি। ক্রস-সোসাইটাল গবেষণার দু'টি প্রধান কাজ হলো, পুনরাবৃত্তি ও সাধারণীকরণ। প্রথম কাজটির মাধ্যমে কোন সমাজের প্রাপ্ত সম্পর্কগুলো একই ধরণের অন্য

আরেকটি সমাজে পাওয়া যায় কি না তা দেখা হয়। দ্বিতীয়টির মাধ্যমে কোন সমাজের পরীক্ষিত সম্পর্ক অন্য সমাজগুলোর ক্ষেত্রেও সত্য হবে কি না তা যাচাই করা হয়।

পরীক্ষণ কী (What is Experiment)?

আমরা প্রাত্যাহিক জীবনে সবসময় কোন না কোনভাবে পরীক্ষণকে ব্যবহার করে থাকি। মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ জীবনের মান উন্নয়ন এবং প্রতিদিনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আসছে। যেমন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারকদের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, দাম্পত্য জীবনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ, শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে উন্নত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষকের বিভিন্ন পাঠদান পদ্ধতির অনুসরণ, সুস্বাদ খাবার তৈরির জন্য রাধুনীর বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ, ক্রেতাদের মন জয় করার জন্য ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ব্যবহার, ইত্যাদি। কখনো এগুলো হয়েছে আনুষ্ঠানিক গবেষণার মাধ্যমে, আবার কখনো হয়েছে অনানুষ্ঠানিক অনুশীলনের মাধ্যমে। তবে, এর সব কিছুকে পরীক্ষণ বলে বিবেচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা একমত নন।

তাহলে, পরীক্ষণ বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়? সাধারণভাবে, পরীক্ষণ এক ধরণের গবেষণা নক্শার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেখানে স্বাধীন চলক ও গবেষণার বিষয়কে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষকের নিয়ন্ত্রণ থাকে। একটি সত্যিকার আদর্শ পরীক্ষণ হলো একটি নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারে পরিচালিত অনুসন্ধান পদ্ধতি, যেখানে স্বাধীন চলকের প্রভাবকে মূল্যায়িত করা হয় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য অপ্রাসঙ্গিক, বাহ্যিক ও বিভ্রান্তিমূলক প্রভাবকে দূর করা হয়। পরীক্ষণ দু'টি চলকের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের উপস্থিতি, এর ধরণ ও মাত্রাকে নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত হয়। নিয়ম অনুযায়ী, পরীক্ষণ কিছু মাত্রায় হলেও পারিপার্শ্বিকতাকে উদ্দেশ্যমূলভাবে ব্যবহার করে এবং আচরণ, মনোভাব, সম্পর্ক, ইত্যাদির উপর এই উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের প্রভাবকে মূল্যায়ন করে। যে উপাদানগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা হয় সেই উপাদানগুলো ছাড়া অন্যান্য সব উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করার ভিত্তিতে পরিবেশকে উদ্দেশ্যমূলভাবে ব্যবহারের বিষয়টি খুব নিয়মবদ্ধভাবে কার্যকর করা হয়। এই কৌশলের পিছনে যুক্তিটি হলো যে, যদি একটি চলক অন্তর্ভুক্ত করার পরে আচরণের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে, তবে বুঝতে হবে যে, তা ঘটেছে ঐ চলকের কারণে। স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য পরীক্ষককে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, স্বাধীন চলক ছাড়া অন্য কোন উপাদান যেন নির্ভরশীল চলককে প্রভাবিত না করে। সম্ভাব্য যে সকল অপ্রাসঙ্গিক উপাদান পরীক্ষণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে তার সবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে এ ধরণের উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে, পরীক্ষককে সে সকল উপাদানের প্রভাব মূল্যায়ন এবং ফলাফল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সেই ভ্রান্তিগুলোকে বিবেচনায় আনতে সক্ষম হতে হবে।

সামাজিক বিজ্ঞানে পরীক্ষণ তেমন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, এর অনমনীয় কাঠামোটি সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রয়োগ করা কষ্টকর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা একেবারেই প্রয়োগযোগ্য হয় না। এ পরিস্থিতিতে, যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় সেটি হলো, তাহলে কেন আমরা সামাজিক বিজ্ঞানে পরীক্ষণ নিয়ে আলোচনা করি? এর দু'টি কারণ রয়েছে। *প্রথমতঃ*, ধ্রুপদী পরীক্ষণমূলক গবেষণা নক্শা আমাদের অন্যান্য সকল গবেষণা নক্শার যুক্তিকে বুঝতে সাহায্য করে। এটি একটি আদর্শ, যার বিপরীতে আমরা অন্যান্য গবেষণা নক্শাকে মূল্যায়ন করতে পারি। *দ্বিতীয়তঃ*, পরীক্ষণের তাৎপর্যটি হলো যে, এটি গবেষককে কার্য-কারণমূলক উপসংহার টানতে এবং স্বাধীন চলক নির্ভরশীল চলকের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনে কিনা তা তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিশ্রমে পর্যবেক্ষণের কাজটিকে সম্ভব করে তোলে। অন্যান্য গবেষণা নক্শার মাধ্যমে তা সহজভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, যখন আমরা ধ্রুপদী পরীক্ষণমূলক নক্শার যুক্তিটি বুঝতে সক্ষম হবো, তখন আমরা অন্যান্য গবেষণা নক্শার সীমাবদ্ধতাকেও বুঝতে সক্ষম হবো।

যদি গবেষক বাস্তব পরিবেশের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেন, তবে পরীক্ষণাগারের বাইরে বাস্তব জগতেও পরীক্ষণ পরিচালনা করা সম্ভব হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, ধ্রুপদী পরীক্ষণমূলক গবেষণা নক্শা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণায় বিকশিত হয়েছে বলে আমরা পরীক্ষণকে সামাজিক গবেষণার পরিবর্তে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সম্পর্কিত করে থাকি। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষণমূলক নক্শা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, সামাজিক মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ একটি প্রধান গবেষণা নক্শা হিসাবে বিবেচিত হয়। এ ছাড়াও, নীতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন গবেষণায় পরীক্ষণ গবেষণা নক্শা ধীরে ধীরে কিছুটা উপযোগী হয়ে উঠেছে। যদিও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ বেশী ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন গবেষক এটিকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গবেষণায় ব্যবহার করে আসছেন।

পরীক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvanteges of Experiments)

বিভিন্ন চলকের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পরীক্ষণ সম্ভবতঃ যে কোন গবেষণা নক্শার চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ নক্শা। পরীক্ষণমূলক নক্শার কতগুলো সুবিধা রয়েছে। *প্রথমতঃ*, এখানে গবেষণার প্রধান চলক বা চলকসমূহের উপর গবেষকের নিয়ন্ত্রণ থাকে। *দ্বিতীয়তঃ*, আদর্শ পরিস্থিতিতে, এই নক্শা ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষক স্বাধীন চলকের সংখ্যা সীমিত করতে পারেন এবং সেগুলোকে প্রয়োজন মতো উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভরশীল চলকের মধ্যে সেগুলো কি পরিবর্তন ঘটায় তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। *তৃতীয়তঃ*, তিনি এমনভাবে পরীক্ষণটি পরিচালনা করতে চেষ্টা করেন যেন নির্ভরশীল চলকের উপর স্বাধীন চলক বা চলকসমূহের মধ্যে ভিন্নতাটি সর্বাধিক হয়। *চতুর্থতঃ*, যে সকল সম্পর্কিত চলক অনুকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে গবেষক নির্ভরশীল চলকের উপর সেগুলোর প্রভাব কমাতে বা দূর করতে পারেন। *পঞ্চমতঃ*, গবেষক বহিরাগত বা অপ্রাসঙ্গিক (extraneous) চলককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। *ষষ্ঠতঃ*, গবেষক একই অনুসন্ধান একই প্রেক্ষাপটে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করার মতো অবস্থা তৈরি করে নিতে পারেন।

তবে, পরীক্ষণের কিছু অসুবিধাও রয়েছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধাটি হলো যে, পরীক্ষণের পারিপার্শ্বিকতাটি হলো কৃত্রিম, যার ফলে সামাজিক প্রক্রিয়ার বাস্তবতাটি সেখানে অনুপস্থিত থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশে যা ঘটে তা কৃত্রিম পরিবেশে পুনরাবৃত্তি করা যায় না। ফলে, পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত সামাজিক প্রসঙ্গগুলোকে বিশ্লেষণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। অন্য অসুবিধাটি হলো যে, অধিকাংশ পরীক্ষণ এমন সব নমুনার উপর পরিচালনা করা হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল হয় না। ফলে, পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণীকরণের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

নমুনা নির্বাচনের পদ্ধতি (Methods of Sample Selection)

অন্যান্য গবেষণার মত পরীক্ষণমূলক গবেষণা একইভাবে পরিচালিত হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নমুনার নির্বাচনটি করা হয় সম্ভাবনামূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে। পরীক্ষণে অন্তর্ভুক্ত নমুনার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। *প্রথমতঃ*, এটি দু'টি উপ-নমুনা দল নিয়ে গঠিত — পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দল। নির্ভরশীল চলকের উপর স্বাধীন চলকের প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত যে কোন গবেষণায় এ দু'টি দলের উপস্থিতি থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। *দ্বিতীয়তঃ*, এই দু'টি দলের মধ্যে কোন নিয়মবদ্ধ পার্থক্য রয়েছে কিনা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি কোন তফাৎ থাকে, তবে তা অবশ্যই কোন দৈব কারণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্য হতে হবে। *তৃতীয়তঃ*, পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দলের সদস্যদের অবশ্যই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই রকম হতে হবে। যেমন, বয়স, শিক্ষা, বাসস্থান, ইত্যাদি। কারণ, দু'টি দলের মধ্যে কোন তফাৎ থাকলে স্বাধীন চলকের প্রভাবটি বিভ্রান্তিমূলক হবে। *চতুর্থতঃ*, নমুনা নির্বাচন 'নমুনায়ন পক্ষপাতমুক্ত' হতে হবে। সম্ভাবনামূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নির্বাচনের মাধ্যমে এই পক্ষপাতমুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

দৈব চয়নকে নিশ্চিত করা হয় দৈব সংখ্যার সারণি, বা ব্যক্তিগত ইচছাকে প্রশ্রয় দেয় না এমন যে কোন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে।

পরীক্ষণে দু'টি পদ্ধতিতে পক্ষপাতমুক্ত সমরূপ নমুনা নির্বাচনকে নিশ্চিত করা হয় — দৈব চয়ন (random selection) ও সমকক্ষতা নির্ধারণ (matching)। একটি নমুনা কাঠামো থেকে দৈব চয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন করে দু'টি দলে বিভক্ত করা হয়। এর যে কোন একটিকে পরীক্ষণ দল এবং অন্যটিকে নিয়ন্ত্রিত দল বলে চিহ্নিত করা হয়। দৈব চয়নকে নিশ্চিত করা হয় দৈব সংখ্যার সারণি, বা ব্যক্তিগত ইচছাকে প্রশ্রয় দেয় না এমন যে কোন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন, একটি মুদ্রার মাথা ও লেজ বরাদ্দ করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দু'টি দলে বিভক্ত করা যায়। যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হবার সমান সম্ভাবনা থাকে। তবে, এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানব সমগ্রকে এ ধরণের দৈব চয়ন নিরূপণ করা সবসময় বাস্তবসম্মত হয় না। যেমন, স্বাস্থ্য কর্মীদের দৈবভাবে পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দলে বিভক্ত করা সম্ভব — যথাক্রমে, যারা একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং অন্যটি করছে না। কিন্তু মানুষকে দৈবভাবে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বা বৈবাহিক মর্যাদাভুক্ত গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায় না। তবুও যথাসম্ভব সমকক্ষতা নির্ধারণের প্রক্রিয়ার তুলনায় দৈবচয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিৎ। কিন্তু কোনভাবেই যদি দৈব চয়ন সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে সমকক্ষতা বা সমরূপতা নির্ধারণের মানদন্ডটি একমাত্র বিকল্প হিসাবে আমাদের সামনে বিদ্যমান থাকে।

সমকক্ষতা নির্ধারণ বলতে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির একই রকম বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জোড়া মিলানোকে বুঝায়, যাতে করে জোড়বাধা দু'টি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য একই রকম হয়।

সমকক্ষতা নির্ধারণ বলতে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির একই রকম বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জোড়া মিলানোকে বুঝায়, যাতে করে জোড়বাধা দু'টি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য একই রকম হয়। একই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জোড়া মিলানোর পর একজনকে পরীক্ষণ দল এবং অন্যজনকে নিয়ন্ত্রিত দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন, যদি পরীক্ষণ দলের একজন ব্যক্তি শহরে দুই পুরুষ বসবাসকারী পরিবারের ৩০ বছর বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি হয়, তবে নিয়ন্ত্রিত দলের অন্তর্ভুক্ত জোড়ার অন্য ব্যক্তিটিকেও একই বৈশিষ্ট সম্পন্ন হতে হবে। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বয়স, বাসস্থান, লিঙ্গ এবং শহরে বসবাসের সময়কাল-এর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। পরীক্ষণ দলে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নমুনার সমকক্ষ নমুনা নিয়ন্ত্রিত দলেও থাকতে হবে। নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা নির্বাচিত হয়। সমকক্ষতা নির্ধারণ বা সমরূপতা নিরূপণের প্রক্রিয়াটি দৈব চয়নের চেয়ে কার্যকর নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি। কারণ, এই পদ্ধতিটি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় উচ্চ মাত্রায় সমরূপতাকে নিশ্চিত করে। দৈব চয়ন নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতাকে নিশ্চিত করলেও সমকক্ষতা বা সাদৃশ্যকে নিরূপণ করতে পারে না। সমকক্ষতা নিরূপণ উপাত্ত সংগ্রহের পূর্বে এবং পরে দুই সময়েই করা যায়। কিন্তু যদি সমকক্ষতা নিরূপণ করা সম্ভব না হয়, তবে বস্তুনিষ্ঠতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতার কারণে দৈব চয়নকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পরীক্ষণের প্রকারভেদ (Types of Experiment)

পরীক্ষণ গবেষণা নক্শা যে ধরণেরই হোক না কেন, পরীক্ষণ বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। এর কিছু মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং অন্যগুলো সমাজবিজ্ঞানীসহ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সামাজিক বিজ্ঞানে পরীক্ষণের যে রূপগুলো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো, গবেষণাগার পরীক্ষণ (laboratory experiments), মাঠ পরীক্ষণ (field experiments) ও প্রদর্শন পরীক্ষণ (demonstration experiments)। গবেষণাগার পরীক্ষণ হলো সনাতন ধরণের পরীক্ষণ। যখন কেউ পরীক্ষণ শব্দটির অর্থের ব্যাখ্যা ছাড়া উল্লেখ করেন বা এর সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন তিনি এই সনাতনী পরীক্ষণকেই নির্দেশ করে থাকেন। এ ধরণের পরীক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হলো, এগুলো গবেষণাগারে পরিচালিত হয়, যেখানে সব অপ্রাসঙ্গিক বা বাহ্যিক উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্যদিকে, মাঠ পরীক্ষণ গবেষণাগারে পরিচালিত না হয়ে কোন শহর, গ্রাম, শ্রেণীকক্ষ, শিল্প, কারখানা, ইত্যাদির মত বাস্তব পরিস্থিতিতে পরিচালিত হয়। প্রদর্শন পরীক্ষণ গবেষণাগার বা মাঠ যে কোন স্থানেই পরিচালিত হতে পারে। তবে, তা শুধুমাত্র পরীক্ষণ দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। এ ধরণের পরীক্ষণ মানব আচরণের বিশেষ দিক বা ধারার ব্যাখ্যা, প্রতিফলন, বা প্রদর্শন করতে সাহায্য করে। এগুলো সত্যিকার অর্থে পরীক্ষণ নয়। কারণ, এই পরীক্ষণের কোন নিয়ন্ত্রিত দল থাকে না বলে তুলনা

করা সম্ভব হয় না, এগুলো দৈবভাবে নমুনা নির্বাচন করে না, এবং পরীক্ষণগত প্রয়োগের জন্য কোন সুস্পষ্ট সময় নির্ধারণ করে না।

পরীক্ষণমূলক নক্শার প্রকারভেদ (Types of Experimental Design)

বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মনোবিজ্ঞানী ও সামাজিক বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষণমূলক নক্শা ব্যবহার করে থাকেন। এই নক্শাগুলোর পার্থক্য নিহিত থাকে প্রধানতঃ প্রতিটি পরীক্ষণের মধ্যে পরীক্ষণমূলক ও নিয়ন্ত্রিত দলের সংখ্যা, পূর্ব-পরীক্ষা (pre-tests) এবং স্বাধীন চলক কিভাবে ব্যবহার করা হয় তার উপর। পরীক্ষকের লক্ষ্য থাকে স্বাধীন চলক ছাড়া অন্যান্য চলকের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা। গবেষকদের দ্বারা বহুল ব্যবহৃত কিছু নক্শার উল্লেখ করা যেতে পারে।

পূর্বে ও পরে পরীক্ষণ নক্শা (Before and After Exprerimental Design): পরীক্ষণমূলক নক্শার সবচেয়ে সহজ, সরল ও সাদামাদা প্রকরণটিতে শুধু একটি পরীক্ষণ দলকে ব্যবহার করা হয় এবং কোন নিয়ন্ত্রিত দল ব্যবহার করা হয় না। সে জন্য এটিকে 'নিয়ন্ত্রিত দল ছাড়া পূর্বে ও পরে পরীক্ষণ নক্শা' বলে। পরীক্ষা-পূর্ব ও পরীক্ষা-পরবর্তী মানের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া যায় সেই পার্থক্যটি নির্ভরশীল চলকের উপর স্বাধীন চলকের সম্ভাব্য প্রভাবকে নির্দেশ করে। যেহেতু এই নক্শায় কোন নিয়ন্ত্রিত দল থাকে না, সেহেতু নির্ভরশীল চলকের উপর অপ্রাসঙ্গিক চলকের প্রভাবকে পরিমাপ করা যায় না। অতএব, এটি একমাত্র তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন গবেষক অনুমান করতে পারবেন যে, নির্ভরশীল চলকের উপর অপ্রাসঙ্গিক চলকের প্রভাব নেই বললেই চলে। অর্থাৎ, ধরা নেয়া হয় যে, নির্ভরশীল চলকের উপর পরীক্ষা-পূর্ব ও পরীক্ষা-পরবর্তী পরিবর্তনগুলো ঘটেছে পরীক্ষামূলক উদ্দীপকের কারণে। যদি পরীক্ষকের অনুমান ভুল হয় এবং অপ্রাসঙ্গিক চলকের প্রভাব পরীক্ষা-পূর্ব ও পরীক্ষা-পরবর্তী মানের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়, তবে এর কতটুকু পরীক্ষামূলক উদ্দীপকের কারণে এবং কতটুকু অনিয়ন্ত্রিত অপ্রাসঙ্গিক চলকের কারণে হয়েছে তা তিনি জানতে পারেন না। একটি নিয়ন্ত্রিত দল যুক্ত করে এবং কোন কারণমূলক উদ্দীপক ব্যবহার না করে পরীক্ষণটি পুনরায় পরিচালিত করার মাধ্যমে এই প্রভাবগুলোকে আলাদা করা যায়।

ধ্রুপদী পরীক্ষণমূলক নক্শা (Classical Experimental Design): এই নক্শায় পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দল দু'টিকে ব্যবহার করা হয়। যদিও দু'টি দলকেই পরীক্ষণের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দল স্বাধীন চলকের প্রতি উন্মুক্ত থাকে না। স্বল্প সময়ের জন্য পরিচালিত পরীক্ষণে নিয়ন্ত্রিত দল অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদি পরীক্ষণে অংশগ্রহণকারীকে পরীক্ষণাগার ত্যাগ করতে দেয়া না হয়। কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষণ দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিচালনা করা হয়। কারণ, যদি পূর্ব-পরীক্ষা, পরীক্ষামূলক উদ্দীপক ও পরবর্তী-পরীক্ষা স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়, তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা সহজেই পরীক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারেন বলে গবেষণার ফলাফল পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। সে জন্যে, অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জানতে দেয়া হয় না। কিন্তু এ ধরণের অনুশীলন নৈতিকতা বিরোধী। আবার যদি পরীক্ষণ দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিচালিত হয়, সে ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের উপর অনেক অপ্রাসঙ্গিক চলকের প্রভাব পড়তে পারে। এ ধরণের অপ্রাসঙ্গিক প্রভাবের ক্ষেত্রে, নির্ধারক বা পরীক্ষা চলকের প্রভাবের সাথে অনিয়ন্ত্রিত অপ্রাসঙ্গিক চলকের প্রভাবগুলো যুক্ত হয়ে যায়। আমরা জানি যে, একটি নিয়ন্ত্রিত দল ছাড়া কোনভাবেই বলা যায় না যে, মোট প্রভাবের কতটুকু প্রকৃত কারণ এবং কতটুকু অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের প্রভাব। যদি পরীক্ষণ দলের সাথে একটি নিয়ন্ত্রিত দলকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে প্রভাবের মোট যে মানটি পাওয়া যায় তা থেকে খুব সহজেই অপ্রাসঙ্গিক চলকের মানটি বাদ দিয়ে পরীক্ষণমূলক পরীক্ষা চলকের বা উদ্দীপকের প্রভাবটিকে নির্ণয় করা যায়। যদি নির্ভরশীল চলকের উপর পরীক্ষা চলকের কোন প্রভাব না থাকে, তবে নিয়ন্ত্রিত দলের মধ্যে পরীক্ষা-পূর্ব ও পরীক্ষা-পরবর্তী মানের পার্থক্য পরীক্ষণ দলের মধ্যে প্রাপ্ত পার্থক্যের সমান হবে। এটি প্রত্যাশা করা হয় যে, নিয়ন্ত্রিত দলের পার্থক্যের মান পরীক্ষণ দলের পার্থক্যের মানের চেয়ে বেশী হবে না। যদি পরীক্ষণ দলের

যদি নির্ভরশীল চলকের উপর পরীক্ষা চলকের কোন প্রভাব না থাকে, তবে নিয়ন্ত্রিত দলের মধ্যে পরীক্ষা-পূর্ব ও পরীক্ষা-পরবর্তী মানের পার্থক্য পরীক্ষণ দলের মধ্যে প্রাপ্ত পার্থক্যের সমান হবে।

পার্থক্যটি নিয়ন্ত্রিত দলের পার্থক্যের চেয়ে কম হয়, তবে তা নির্ভরশীল চলকের উপর নির্ধারক বা পরীক্ষা চলকের ঋণাত্মক প্রভাবকে নির্দেশ করবে।

একমাত্র-পরবর্তী পরীক্ষণ নক্শা (Only-After Experimental Design): পরীক্ষণের এই নক্শাটি ধ্রুপদী পরীক্ষণমূলক নক্শার মতই। তবে পার্থক্যটি হলো, পরীক্ষণ দল বা নিয়ন্ত্রিত দলের কোনটিকেই পূর্ব-পরীক্ষা করা হয় না। একমাত্র-পরবর্তী পরীক্ষণ নক্শা প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষক পরীক্ষণ দলের উপর একটি পরীক্ষা চলক প্রয়োগ করে পরীক্ষণ দলের সাথে নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনা করেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে, এই নক্শায় শুধুমাত্র একটি দলের উপর পরীক্ষা চলকটিকে প্রয়োগ করা হয় এবং কোন পূর্ব-পরীক্ষা করা হয় না। নির্ভরশীল চলকের উপর স্বাধীন বা পরীক্ষা চলকের প্রভাবকে পরীক্ষা-পরবর্তী পরিমাপের মাধ্যমে তুলনা করা হয়। পরীক্ষা-পূর্ব পরিমাপ ব্যবহার না করার ফলে সৃষ্ট সরলতার কারণে এই নক্শাটি সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত পরীক্ষণ নক্শা। এটি ঠিক যে, যদি নমুনার আকারটি বৃহৎ হয় এবং নমুনাকে দৈবভাবে চয়ন করা হয়, সে ক্ষেত্রে পূর্ব-পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এ ধরণের গবেষণায় পরীক্ষা-পূর্ব পরিস্থিতিতে পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দলের পরিমাপের মান কি ছিলো, বা পরীক্ষা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে পরীক্ষা চলক ছাড়া অন্য কোন উপাদানের প্রভাব প্রাপ্ত পরিমাপের উপর পড়েছে কিনা তা জানা যায় না।

সলোমোন চার-দল নক্শা (Solomon Four-Group Design): একটি পরীক্ষণমূলক নক্শায় পূর্ব-পরীক্ষার যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। পূর্ব-পরীক্ষা সময়ের ক্রমপরম্পরায় মূল্যায়নের সুযোগ এবং তুলনার ভিত্তি প্রদান করলেও তা ফলাফলের উপর মারাত্মকভাবে প্রতিক্রিয়ামূলক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন, কোন বিশেষ কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত পরীক্ষণে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংবেদনশীল করে তোলার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায়, বাস্তবায়নের পূর্বে কর্মকান্ডটি সম্পর্কে জনগণের মনোভাবের পরিমাপ গ্রহণ করলে একটি পূর্ব-পরীক্ষা জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে এবং পূর্ব-পরীক্ষা করা হয় নি এমন জনগণের তুলনায় ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। এ ধরণের সমস্যা মোকাবেলার জন্য 'সলোমোন চার-দল নক্শা' প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই নক্শায় চারটি দল ব্যবহার করা হয়। ধ্রুপদী পরীক্ষণ নক্শার মত এটিতে একটি পরীক্ষণ দল ও একটি নিয়ন্ত্রিত দলের পাশাপাশি আরো অতিরিক্ত একটি করে পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দল থাকে, যার উপর পূর্ব-পরীক্ষা পরিচালনা করা হয় না। অতএব, দু'টি পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দলের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে পূর্ব-পরীক্ষার ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ামূলক প্রভাবকে সরাসরি পরিমাপ করা সম্ভব হয় এবং পূর্ব-পরীক্ষার মাধ্যমে যাদের সংবেদনশীল করা হয় নি তাদের উপর পরীক্ষা চলকের স্বাধীন প্রভাব রয়েছে কি না, তা এই তুলনাগুলোর মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। তবে, প্রায়োগিক জটিলতার কারণে পরীক্ষণমূলক গবেষণায় এই নক্শা কম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাঠ পরীক্ষণ (Field Experiment): আমরা জানি যে, মাঠ পরীক্ষণ অন্যান্য পরীক্ষণ থেকে আলাদা। কারণ, সেগুলো গবেষণাগারে পরিচালিত না হয়ে বাস্তব পরিস্থিতিতে পরিচালিত হয়। গবেষণাগারে একটি কৃত্রিম ব্যবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় স্বাভাবিকত্ব পাওয়া সম্ভব হয় না। আবার কখনো গবেষণার প্রপঞ্চটি এমন জটিল হতে পারে যে, তাকে একটি গবেষণাগারের বিন্যাসে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। এ ধরণের পরিস্থিতিতে গবেষণার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এ ক্ষেত্রে, সাধারণতঃ সামাজিক দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় কিংবা কোন এলাকার জনগণকে গবেষণার একক হিসাবে নেয়া হয়। এই পরীক্ষণে, পরীক্ষণের সব উপাদানগুলোকে রক্ষা করা হয়। যেমন, পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দলের ব্যবহার, দৈব চয়নের মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন, পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণের সুনির্দিষ্টতা নির্ধারণ, পূর্ব-পরীক্ষা, পরবর্তী-পরীক্ষা, ইত্যাদি। এই পরীক্ষণের প্রকৃতি, সামাজিক বাস্তবতার সাথে এর সংযুক্তি এবং প্রাপ্ত ফলাফলের জন্য উচ্চতর সাধারণীকরণ প্রদান করে বলে মাঠ পরীক্ষণ সামাজিক বিজ্ঞানীদের কাছে একটি অধিকতর উপযোগী পরীক্ষণ নক্শা বলে বিবেচিত হয়েছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাঠ গবেষণা এবং মাঠ পরীক্ষণ দু'টিই বাস্তব পরিবেশে পরিচালিত হলেও মাঠ পরীক্ষণ ও মাঠ গবেষণা এক নয়। বাস্তব পরিবেশে পরিচালিত সকল গবেষণাই (যেমন, কেস

স্টাডি, ক্রস-সেক্শনাল জরিপ, দীর্ঘকালীন জরিপ, ইত্যাদি) মাঠ গবেষণা, কিন্তু সকল মাঠ গবেষণাই মাঠ পরীক্ষণ নয়।

মাঠ গবেষণা এবং মাঠ পরীক্ষণ দু'টিই বাস্তব পরিবেশে পরিচালিত হলেও মাঠ পরীক্ষণ ও মাঠ গবেষণা এক নয়। বাস্তব পরিবেশে পরিচালিত সকল গবেষণাই মাঠ গবেষণা, কিন্তু সকল মাঠ গবেষণাই মাঠ পরীক্ষণ নয়।

কিন্তু মাঠ পরীক্ষণের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। *প্রথমতঃ*, বাস্তব পরিস্থিতিতে একই রকম ব্যক্তি বা দল খুঁজে পাওয়া কষ্টকর এবং কখনো কখনো তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। *দ্বিতীয়তঃ*, অনেক সময়, তুলনাযোগ্য বাস্তব পরিবেশের নির্বাচন দুরূহ হয়ে পড়ে এবং এর ফলে এই পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার ও উপযোগীতা হ্রাস পায়। *তৃতীয়তঃ*, মাঠ পরীক্ষণ অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি। তবে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, একজন গবেষক পরীক্ষণের প্রক্রিয়াকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবেন, যার ফলে একদিকে পরীক্ষণের সব শর্তকে পূরণ করবেন এবং অন্যদিকে বাস্তব পরিবেশের স্বাভাবিকতা বজায় রাখবেন? এই ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যাটি হলো যে, মাঠ পরীক্ষণ যখন গবেষণাগার পরীক্ষণে পরিণত হয়, তখন তা আর প্রকৃত গবেষণাগার পরীক্ষণ থেকে ভিন্ন থাকে না।

সারাংশ

এই পাঠে আমরা ব্যাখ্যামূলক গবেষণার দু'টি নক্শা — জরিপ ও পরীক্ষণ — নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনায় ব্যাখ্যামূলক জরিপ নক্শা, পরীক্ষণ ও এদের প্রকারভেদের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ, গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষণা নক্শার গুরুত্ব এবং সুনির্দিষ্টভাবে জরিপ ও পরীক্ষণের ভূমিকাই এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। শুধু গবেষণা নক্শার গুরুত্বই নয়, এদের মধ্যে পার্থক্যও আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠ শেষে আমরা জেনেছি যে, সমস্যার প্রকৃতি, গবেষণার উদ্দেশ্য ও ধরণের উপর গবেষণা নক্শা অনেকাংশেই নির্ভর করে। গবেষণা সমস্যা নির্ধারণ এবং গবেষণা পরিচালনার জন্য নক্শা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গবেষক এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হলে যথাযথ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। ব্যাখ্যামূলক জরিপে সাধারণতঃ

ক. এক ধরণের নক্শা ব্যবহৃত হয়
খ. দু'ধরণের নক্শা ব্যবহৃত হয়
গ. তিন ধরণের নক্শা ব্যবহৃত হয়
ঘ. উপরের সব।

২। পরীক্ষণের সবচেয়ে বড় অসুবিধাটি হলো:

ক. পরীক্ষণে অর্থ ব্যয় হয় বেশী
খ. পরীক্ষণের পারিপার্শ্বিকতা হলো কৃত্রিম
গ. পরীক্ষণের নমুনা-সংখ্যা বেশী প্রয়োজন হয়
ঘ. পরীক্ষণ একটা নির্দিষ্ট সময়ে করতে হয়।

৩। সামাজিক বিজ্ঞানে পরীক্ষণ তেমন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না। কারণ,

ক. এর অনমনীয় কাঠামো
খ. পরীক্ষণে অর্থ বেশী ব্যয় হয়
গ. সময় বেশী লাগে
ঘ. তত্ত্বগতভাবে জটিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পরীক্ষণের সুবিধাগুলো কী?

২। ক্রস-সোসাইটাল জরিপ নক্শা কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমাজ গবেষণায় পরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উদাহরণসহ আলোচনা করুন?

২। পরীক্ষণ কী? পরীক্ষণের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

অন্যান্য গবেষণা নক্‌শা
Other Research Designs

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- সংহত দল আলোচনা
- দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন
- অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন
- মূল্যায়ন গবেষণা

পূর্ববর্তী পাঠগুলোতে আমরা জেনেছি যে, সমস্যার প্রকৃতি, গবেষণার উদ্দেশ্য ও ধরণের উপর গবেষণা নক্‌শা অনেকাংশেই নির্ভর করে। কোন প্রপঞ্চ বা ঘটনার অনুসন্ধান, বর্ণনা কিংবা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তিনটি প্রধান গবেষণা নক্‌শা রয়েছে। যেমন, কেস স্টাডি, জরিপ, ও পরীক্ষণ। কিন্তু এই তিনটি গবেষণা নক্‌শায় ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতিগুলো সামাজিক বিজ্ঞানের সকল ধরণের সমস্যাকে অধ্যয়নের জন্য পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এবং প্রয়োজনেও সেগুলোকে প্রয়োগ করা যায় না। তাই সামাজিক বিজ্ঞানীরা আরো কিছু গবেষণা নক্‌শা উদ্ভাবন করেছেন। যেমন, সংহত দল আলোচনা (focus groups discussion), দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন (rapid rural assessment), অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (participatory rural assessment), মূল্যায়ন গবেষণা (evaluation research), ইত্যাদি। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই গবেষণা নক্‌শাগুলো কোন মৌলিক গবেষণা নক্‌শা নয়। প্রতিটিই কোন না কোনভাবে মৌলিক গবেষণা নক্‌শাগুলোর ভিন্ন ধরণ। এই পাঠে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ্ধতিকে আলোচনা করা হবে।

সংহত দল আলোচনা (Focus Groups Dicussion)

Kurt Lewin সর্ব প্রথম এফ জি ডি ব্যবহার করেন।

আজকাল বহু সামাজিক গবেষক সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, গ্রাম উন্নয়ন, ইত্যাদি) সংহত দল আলোচনা পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন এবং এর ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কার্যক্ষেত্রে, এটি এফ জি ডি নামেই বেশী পরিচিত। ১৯৩৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Kurt Lewin সর্ব প্রথম এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন এবং মতামত ও মনোভাব গবেষণার জন্য ১৯৫০-এর দশকে Frankfurt Institute of Social Research ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতির ব্যবহার করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের আচরণ ও মনোভাব জানার জন্য ৭০-এর দশকে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে এই সংহত দল আলোচনা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেন। জরিপ, মূল্যায়ন বা নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির মতো ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতির পরিবর্তে অধিক কার্যকরী গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে সংহত দল আলোচনাকে ব্যবহার করা হয়। মূলতঃ, কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি কর্মসূচি সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমধর্মী সদস্যদের মধ্য থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একটি ক্ষুদ্র দলকে সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনার সুযোগ দিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার পদ্ধতিকে সংহত দল আলোচনা বলে।

সংহত দল আলোচনার পদ্ধতিটি প্রথমে গোষ্ঠী প্রক্রিয়া অধ্যয়নের বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থাকলেও পরবর্তীতে এটি আলোচনার বিষয়বস্তুকে অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর প্রধান উদ্দেশ্যটি দলকে বিশ্লেষণ করা নয়, বরং এটি প্রধানতঃ দলের সদস্যদের মধ্য থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি কৌশল। সংহত দল আলোচনা পদ্ধতিটি গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রেই অধিক ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত মূল প্রত্যাশাটি হলো যে, একটি দলের পরিবেশ দলের সদস্যদের পারস্পরিক উদ্দীপনার মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনাকে উৎসাহিত করবে, সামাজিক ও

জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহকে বৃদ্ধি করবে, পরিবেশকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আলোচনায় নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিকে আলোচনার গতি প্রকৃতিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম করবে, এবং প্রকৃত আবেগ, অনুভূতি ও স্বতস্ফুর্ততার সাথে মতামত উপস্থাপনকে সুযোগ প্রদান করবে।

সংহত দল আলোচনার উদ্দেশ্য (Purposes of Focus Groups Discussion): সংহত দল আলোচনা পদ্ধতিকে কখনো কোন পরিমাণগত গবেষণার ভিত্তি রচনার প্রাথমিক গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে, কখনো একটি স্বনির্ভর ও প্রধান গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে, অথবা একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার গুণগত সম্পূরক হিসাবে, আবার কখনো বহু-পদ্ধতিসম্পন্ন গবেষণার অংশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভের জন্য সংহত দল আলোচনায় পূর্ব নির্ধারিত একটি লক্ষ্য থাকতে হবে। এই লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য দু'টি বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। যেমন, সংহত দল আলোচনাটি যদি অন্য কোন পদ্ধতির সম্পূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এর উদ্দেশ্য এক রকম হবে। আর যদি এটি সম্পূর্ণ একক স্বনির্ভর পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে উদ্দেশ্যটি ভিন্ন রকম হবে। উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচনাকে সঠিক দিক ও বিষয়ের উপর পরিচালনার জন্য পূর্বেই একটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। সংহত দল আলোচনার জন্য দল গঠনের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। দল গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা যেন সমদলভুক্ত হয় এবং নমুনায়নের মাধ্যমে লক্ষ্যদল বা সেবা গ্রহীতার মধ্য থেকেই নির্বাচিত হন। আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য পূর্বে থেকেই একটি স্থান বা সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে পূর্বেই আলোচনার সময় ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

সামাজিক গবেষণার প্রেক্ষাপটে, সংহত দল আলোচনা কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে। *প্রথমতঃ*, গবেষণা-পূর্ব পদ্ধতি হিসাবে এটি গবেষণার উদ্দেশ্য ও সূচকগুলোকে যথাযথ সংজ্ঞায়ন এবং সম্ভাব্য ভ্রান্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মূল গবেষণার প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করে। *দ্বিতীয়তঃ*, গবেষণা-পরবর্তী পদ্ধতি হিসাবে এটি উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রপঞ্চ বা ঘটনার ধারা, ভিন্নতা, যুক্তি ও কারণকে ব্যাখ্যা করতে পারে। *তৃতীয়তঃ*, প্রধান গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে এটি দলের প্রক্রিয়া, স্বতঃস্ফুর্ত অনুভূতি, মনোভাব ও আচরণের যুক্তি ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য পদ্ধতির মত পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে। *চতুর্থতঃ*, একভাবে, এটি আলোচনার প্রগাঢ়তার ফলে দলের ও দলের সদস্যদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং অন্যভাবে, সংহত দল আলোচনা দল প্রক্রিয়া, মনোভাবের পরিবর্তন, দলের সদস্যদের মনোভাব ও মতামত, নির্দিষ্ট পদ্ধতির কার্যকারীতা, ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পেতে সাহায্য করে।

আলোচনা প্রক্রিয়া (Discussion Process): সংহত দল আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্তারিত আলোচনা, চুলচেরা বিশ্লেষণ ও নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে সমাজে বিশেষ মর্যাদা, অভিজ্ঞতা বা আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করা হয়। এ গবেষণা পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য ছয় থেকে বার জনের একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয় যাদের একজনের নেতৃত্বে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী দলে গবেষক উপস্থিত থাকেন। অন্যেরা কেউ প্রতিবেদক, কেউ মধ্যস্থতাকারী, কেউ আলোচক বা অংশগ্রহণকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গবেষক সাধারণতঃ আলোচনা পরিচালনায় সাহায্য করেন। প্রতিবেদক (সাধারণতঃ, এফ জি ডি তে দু'জন প্রতিবেদক থাকেন) আলোচিত প্রতিটি বিষয় পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করেন। আলোচনা পরিচালনার জন্য একটি পূর্ব নির্ধারিত নির্দেশনা ব্যবহার করা হয়।

সংহত দল আলোচনাকে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে পরিচালনা করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে সংহত দল আলোচনার কতগুলো সাধারণ ধাপ রয়েছে যা সব গবেষকই অনুসরণ করে থাকেন। সেগুলো হলো: উত্তরদাতা নির্বাচন, লক্ষ্য নির্ভর আলোচনার সূচনা ঘটানো, আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ। যথাযথ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে দৈবচয়িতভাবে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। দল নির্বাচনের পর দলনেতা গবেষকের দ্বারা

নির্ধারিত প্রশ্ন দিয়ে একটি লক্ষ্যনির্ভর আলোচনার সূত্রপাত করেন। দলনেতা এখানে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। আলোচনাকে উৎসাহিত করা এবং আলোচনার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে আলোচনাকে কোন গতিতে প্রবাহিত করতে হবে তার কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে প্রধানতঃ গবেষকের হাতে। কিন্তু আলোচনা চলাকালীন সময়ে সে কৌশলকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হলো দলনেতার দায়িত্ব। কি ধরণের উপাত্ত এবং কি পদ্ধতিতে তা লিপিবদ্ধ করা হবে সেটি নির্ভর করবে কি ধরণের উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে এবং কি উদ্দেশ্যে তা করা হবে সেটির উপর। উপাত্তকে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধকরণ বেশী নির্ভরযোগ্য হলেও এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ, যন্ত্র ব্যবহারের ফলে দলের সদস্যরা স্বতঃস্ফুর্ততা হারিয়ে ফেলতে পারেন। সে কারণে হাতে হাতে লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি অনেক বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। এর পরে, সংগৃহীত উপাত্তকে মূল্যায়ন করে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

সংহত দল আলোচনার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Focus Group Discussion): সংহত দল আলোচনার মাধ্যমে যে পরিবেশ তৈরি হয় তাতে করে মানুষ মুক্ত মনে তাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন এবং অন্যান্যদের সাথে নিজেদের পরিস্থিতিকে তুলনা করে সমস্যাগুলোকে অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু এই মুক্ত পরিবেশের সুবিধা কখনো কখনো বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি করে। যদি মানুষ মনে করে যে, তাদের মুক্ত মনের প্রকাশ নিজের পেশা, কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে, তবে দলের পরিবেশে অংশগ্রহণকারীরা সত্যিকার মতামতকে প্রকাশ নাও করতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আলোচনায় মুষ্ঠিমেয় কিছু ব্যক্তির প্রাধান্য থাকার কারণে আলোচনার গতি-প্রকৃতি ও ফলাফল প্রত্যাশিত নাও হতে পারে। এমনকি, অনেক অংশগ্রহণকারী আলোচনায় অংশ নাও নিতে পারেন। দলের নেতাকে সন্তুষ্ট রাখা বা বিরোধীতা করার প্রবণতা থেকে সংহত দল আলোচনার উপযোগীতা অনেক বড় সীমাবদ্ধতায় রূপ নিতে পারে। এই প্রবণতাটি বিভিন্ন কারণে জন্ম নিতে পারে। যেমন, অংশগ্রহণকারীরা আলোচনাকে তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করতে চাইলে নেতার সব বক্তব্যকে মেনে নিয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে পারেন; কোন বিষয়ে নেতার দৃঢ় অবস্থান থাকলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সে বিষয়কেই সমর্থন করে নিজেদের মতামতকে গোপন রাখতে পারেন; অথবা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যদি নেতার ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে, সে ক্ষেত্রে দলের সদস্যরা বিভক্ত হয়ে গিয়ে একদল সমর্থন ও অন্যদল বিরোধীতা বা নিরব থেকে আলোচনার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারেন। এই পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করবে দলের নেতা ও দলের বৈশিষ্ট্যের গুণগত মানের উপর। যদি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা তৈরি করা না যায়, তবে আলোচনাকে সংহত রাখা বা সঠিক দিকে পরিচালিত করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো সাধারণতঃ প্রতিনিধিত্বশীল হয় না। এ সব সীমাবদ্ধতার কারণে সামাজিক বিজ্ঞানে সংহত দল আলোচনার পদ্ধতিটি একটি স্বাধীন ও স্বনির্ভর গবেষণা নক্শা হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে বরং মূল গবেষণাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধানমূলক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন (Rapid Rural Assessment)

দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন হলো গ্রামীণ উন্নয়নের উপর দ্রুততার সাথে নতুন তথ্য সংগ্রহ এবং অনুকল্প নির্মাণের জন্য বহু-বিজ্ঞানী সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ দলের দ্বারা মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত একটি আধা-কাঠামোবদ্ধ গবেষণা কর্মকান্ডের উদ্যোগ।

কৃষি-অর্থনীতি ও সামাজিক গবেষণার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত কাঠামোবদ্ধ গবেষণা পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ অধিকতর সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ এবং জটিল ও অনমনীয় হয়ে পড়ে। প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিসংখ্যানগত নির্ভরযোগ্যতা অর্জনের জন্য এক ধরণের অতি মাত্রায় সূক্ষ্মতা অর্জনের চেষ্টা করা হয় বলেও অনেক উন্নয়ন গবেষক মনে করেন। সূক্ষ্মতার মাত্রাকে অক্ষুণ্ন রেখে দ্রুততার সাথে বাস্তবসম্মত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিকল্প পদ্ধতির প্রয়োজন থেকেই দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে। দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্টগুলো হলো এর নমনীয়তা, উদ্ভাবনী কৌশল, সহজসাধ্যতা, সময়োপযোগীতা, স্বল্প সময়ের মধ্যে গবেষণা সম্পাদন, বহু-বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গবেষণা দল গঠন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে সরাসরি উন্নয়নের ধারণা অর্জন। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন হলো গ্রামীণ উন্নয়নের উপর দ্রুততার সাথে

নতুন তথ্য সংগ্রহ এবং অনুকল্প নির্মাণের জন্য বহু-বিজ্ঞানী সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ দলের দ্বারা মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত একটি আধা-কাঠামোবদ্ধ গবেষণা কর্মকান্ডের উদ্যোগ।

একটি মাঠ পর্যায়ের কৌশল হিসাবে দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়নের কতগুলো বিশেষ সুবিধা রয়েছে। *প্রথমতঃ*, দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রসঙ্গ চিহ্নিতকরণ ও অনুসন্ধানের জন্য একটি উপযোগী পদ্ধতি হিসাবে কাজ করে। *দ্বিতীয়তঃ*, এ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি সমস্যার অধ্যয়ন, অনুকল্প পরীক্ষা এবং গবেষণা কর্মসূচীর সার্বিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রসঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্বকে মূল্যায়ন করা যায়। *তৃতীয়তঃ*, দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক জরিপ গবেষণা পদ্ধতির নির্বাচন ও নিবিড় অনুসন্ধান পরিকল্পনার লক্ষ্যে দ্রুত তথ্য সংগ্রহের জন্য সহায়তা করে। *চতুর্থতঃ*, একটি দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়নের অনুশীলন এটি নমুনা জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি, নমুনা এলাকা চিহ্নিতকরণ, আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রকল্প নির্মাণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও তদারকীতে উপযোগী কৌশল হিসাবে কাজ করে। *পঞ্চমতঃ*, নতুন উদ্ভাবন ও কৃৎকৌশলের বিকাশ, হস্তান্তর, ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার কাজে দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন কৌশলকে সুচারুরূপে ব্যবহার করা যায়। *ষষ্ঠতঃ*, জরুরী পরিস্থিতিতে যথার্থ নীতিমালা প্রণয়ন, দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন মূল্যবান উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন অনুশীলনকারীদের একটি বাস্তবসম্মত অবস্থান গ্রহণে সহায়তা করে। দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রামীণ জনগণ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বন্ধন স্থাপনের একটি সীমাহীন সুযোগ তৈরি করে, যা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনাবিদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য যথাযথ ও সময়োচিত তথ্য সংগ্রহ অনেক সহজতর হয়। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন কোন পরিমিত পদ্ধতি নয়, বা মৌলিক গবেষণা নক্শার কোন প্রতিস্থাপক বিকল্পও নয়। এটি যে কোন মৌলিক গবেষণা নক্শার সম্পুরক হিসাবে চমৎকার ফলাফল প্রদান করে। দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জটি হলো উপাত্তের প্রতিনিধিত্বশীলতা ও সঠিকতা অর্জন করা। কারণ, দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে একটি ছোট নমুনা ব্যবহার করা হয় এবং ছোট নমুনার আকার পরিসংখ্যানগত আস্থার প্রয়োজনীয় মাত্রাকে অর্জন করতে পারে না বলে এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাত্তের সঠিকতার মাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়নের মৌলিক নীতিমালা (Fundamentals of Rapid Rural Appraisal): দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি পাঁচটি প্রধান নীতিমালাকে অনুসরণ করে। সেগুলো হলো ত্রিমাত্রীকরণ, পুনরাবৃত্তিকরণ, স্থানীয় জ্ঞানের ব্যবহার, বহু-বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গবেষণা দল গঠন ও নমনীয়তা। উপাত্তের সঠিকতার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে তিনটি ভিন্ন মাত্রা ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে ত্রিমাত্রীকরণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়। ত্রিমাত্রীকরণ পদ্ধতি হলো নিয়মবদ্ধভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি, এলাকা ও নমুনার সংমিশ্রণ। দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পরিচালনার সময় গবেষণা দল গঠন, পর্যবেক্ষণের একক নির্বাচন এবং গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ এ তিনটি ক্ষেত্রেই ত্রিমাত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয়। দল গঠনের ত্রিমাত্রীকরণ বলতে উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহু-বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত একটি গবেষণা দল গঠনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়। পর্যবেক্ষণ এককের জন্য বিভিন্ন মানদন্ডের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্তরায়িত নমুনায়নকে বোঝায়। গবেষণা পদ্ধতির ত্রিমাত্রীকরণ হলো উপাত্তের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন চলকের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল ও হাতিয়ারের সম্মিলিত ব্যবহার।

দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ, সেগুলোর যথার্থতা পরীক্ষা এবং পরিশুদ্ধকরণের জন্য পুনরাবৃত্তিকরণ নীতিমালা ব্যবহার করা হয়। এটি করতে গিয়ে একটি আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এই আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার কৌশল গবেষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং অনুকল্প নির্মাণে যথেষ্ট নমনীয়তা প্রদান করে। পুনরাবৃত্তিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গবেষক ধাপে ধাপে সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন, যা তাকে সমস্যার যথাযথ সমাধান ও কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা

করে। প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচীর পরিবর্তে দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে গবেষক দল সমস্যার প্রকৃত প্রসঙ্গগুলোকে উপলব্ধি করে বাস্তবসম্মত সমাধান চিহ্নিত করার জন্য সরাসরি তথ্যের উৎসের কাছে যেতে পারেন। এই পদ্ধতিতে স্থানীয় অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্যবাহী কৃৎকৌশল, জ্ঞান কাঠামো ও ক্ষমতার অনুশীলনের উপর বেশী জোর দেয়া হয়ে থাকে বলে দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পরিচালনা সত্যিকারভাবে নীচ থেকে উপরে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কার্যকর করে তোলে।

একটি সফল দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। একইসাথে, দলের সদস্যদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং প্রগাঢ় মিথষ্ক্রিয়া সংঘটিত হয় বলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার বিভিন্ন মাত্রাকে বোঝা অনেক সহজ হয়ে উঠে। দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হলো নমনীয়তা। নমনীয়তা বলতে বিভিন্ন পদ্ধতিগত পছন্দ, কৌশল ও হাতিয়ার নির্বাচন, পরিবর্তন, সংশোধন বা সম্মিলন ঘটানোর ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সময়সূচী, ভ্রমণ ও কর্ম পরিকল্পনার সংশোধন করার ক্ষমতা এবং মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সমন্বয়ের সুযোগ গবেষণা দলের হাতে থাকে।

দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পরিচালনা (Conducting a Rapid Rural Appraisal): দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পরিচালনার প্রধান চারটি ধাপ রয়েছে। সেগুলো হলো: প্রস্তুতি গ্রহণ, উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন। অন্যান্য সব গবেষণা পদ্ধতির মত দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পরিচালনার ক্ষেত্রেও গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণা এলাকা, পদ্ধতির বিকাশ, উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল ও হাতিয়ার, অনুকল্প নির্মাণ এবং গবেষণা দল গঠনের উপর প্রয়োজনীয় পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এ সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে গবেষণা দল গবেষণার এলাকা নির্ধারণ, গবেষণা এলাকার নক্শা ম্যাপ প্রণয়ন, এলাকা ভ্রমণ করে সম্ভাবনা ও সংকটের একটি তালিকা নির্মাণ করেন। যে সকল বিষয়ের উপর গবেষণা করা হবে সে সকল বিষয়কে কিভাবে অনুসন্ধান করা হবে তার উপর ভিত্তি করে একটি বিষয়ভিত্তিক নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। এই নির্দেশিকাটিই পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে।

মাঠ গবেষণা সম্পন্ন করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হবে, কি কি প্রসঙ্গ নিয়ে গবেষণা করা হবে, কতগুলো গ্রাম নিয়ে কাজ করা হবে, গবেষণা এলাকা কত দূরে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তুতির সময়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। একটি দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পরিচালনা করতে সাধারণতঃ ৩ থেকে ২০ দিন সময় লেগে যায়। তবে একটি সফল দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য এক সপ্তাহ সময় যথেষ্ট বলে গবেষকগণ মনে করেন। এ পর্যায়ে, গবেষণা দলে কি কি ধরণের বিশেষজ্ঞ থাকবেন এবং কতজন থাকবেন তাও নির্ধারণ করে নিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, দুই থেকে তিন জনের দল খুব ছোট হয়ে যায় এবং ১০ জনের বেশী হলে অনেক বড় হয়ে যায়। সবশেষে, সকল কর্মকান্ডের একটি অনুসূচী প্রণয়ন করতে হবে, যাতে করে একদিকে, প্রতিটি কর্মকান্ডকে যথেষ্ট সময় দেয়া যায় এবং অন্যদিকে, পুরো প্রক্রিয়াটি যেন লাগামহীন হয়ে না পড়ে।

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যে সকল উত্তরদাতাকে নির্বাচন করা হয় তাদেরকে সার্বিকভাবে স্থানীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধিত্বশীল হতে হবে, তাদের সহজগম্য হতে হবে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে এবং সাক্ষাৎকার প্রদানে আগ্রহী হতে হবে। যে সকল ব্যক্তি সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বেশী ওয়াকিবহাল এ রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী উত্তরদাতাকে চিহ্নিত করতে হবে। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী হতে পারে স্থানীয় কর্মকর্তা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, স্কুল শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের তুলনায় দলীয় সাক্ষাৎকারকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ, দলীয় সাক্ষাৎকার অধিকতর অংশগ্রহণমূলক হয়ে থাকে। এতে একসাথে অনেক বেশী তথ্য পাওয়া যায় এবং সাথে সাথে তথ্যের যথার্থতাও যাচাই করা হয়ে যায়। তবে অনেক সময় দলীয় সাক্ষাৎকার সমস্যাও সৃষ্টি করে। যেমন, অনেক তথ্য প্রদানকারী অন্যদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে দ্বিধান্বিত থাকেন। কেন না, সেই তথ্য প্রদানের ফলে উত্তরদাতাদের মধ্যে বিরোধমূলক সম্পর্ক

তৈরি করে, যা পরবর্তীতে তার জন্য ব্যক্তিগত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে, গবেষণা দলকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।

তথ্য সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণের জন্য গবেষণা দল উপাত্তকে সংগঠিত করেন। এটি করতে গিয়ে তারা তথ্যগুলোকে প্রসঙ্গভিত্তিক প্রাধান্য দিয়ে সাজিয়ে ফেলেন। এটি গবেষণা দলের সদস্য এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। তবে যেহেতু প্রাধান্য নির্ধারণের বিষয়টি একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়, সেহেতু সে সকল পদ্ধতি ও মানদন্ড প্রস্তুতিপর্বেই গবেষণা দলকে নির্ধারণ করে নিতে হয়। এ সকল পদ্ধতি ও মানদন্ডের ভিত্তিতে গবেষণা দলের সদস্যরা এলাকাবাসী ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারীদের সহায়তায় যাচাই বাছাই করে কতগুলো প্রসঙ্গকে একটি ভরযুক্ত ক্রমধারায় সাজিয়ে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করেন। দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়নের সফলতা নির্ভর করে একটি অর্থবহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উপর। প্রতিবেদন প্রণয়নে যদিও গবেষণা দলের সকলেই অবদান রাখেন, কিন্তু পুরো প্রতিবেদনটি লেখার দায়িত্ব একজনকেই দেয়া হয়। প্রতিবেদনের প্রথম খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য দলের সকল সদস্যের কাছে বিতরণ করা হয় এবং কয়েক দফা আলোচনার পর খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়।

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (Participatory Rural Assessment)

জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টাই হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন।

যখন কোন বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ থাকে না অথচ জরুরী ভিত্তিতে তথ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন সামাজিক গবেষণায় অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এটি সামাজিক গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। ৮০'র দশকের প্রথম দিক থেকে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংক্ষিপ্তভাবে, জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টাই হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন। এ প্রক্রিয়ায় গবেষক যে শুধু অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে বুঝতে ও জানতে পারেন তাই নয়, তিনি জনগণ ও বহু বিষয়ে নিজেও সচেতন হয়ে উঠতে পারেন। নাম শুনে মনে হতে পারে যে, এ পদ্ধতিতে বোধ হয় শুধুমাত্র গ্রামীণ প্রেক্ষাপটেই গবেষণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিষয়টি তা নয়। শহুরে পরিস্থিতিতে গবেষণার জন্যও এই পদ্ধতির ব্যবহার হতে পারে। যে কোন স্থানীয় অবস্থা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য এটি বিশেষভাবে সহায়ক একটি গুণগত পদ্ধতি।

এই গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষকের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সফল অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। যেমন,

- গবেষণার জন্য নির্বাচিত এলাকায় বসবাসকারী সকলের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- জনগণের প্রতি আস্থা রাখা;
- জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা;
- জনগণ সমস্যাটি সম্পর্ক যা জানেন, বোঝেন, বলেন, দেখান, ও করেন তা জানার আগ্রহ থাকা;
- নিজে কম বলে জনগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা;
- জনগণের মতামত জানার জন্য বিশেষ বিনয় প্রদর্শন করা; এবং সর্বোপরি,
- এমন কৌশল অবলম্বন করা যা জনগণকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা, জ্ঞানের প্রকাশ ও তথ্য বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত করে।

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Participatory Rural Assessment): অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ পদ্ধতির কার্যকারীতাকে প্রমাণ করে। এ পদ্ধতিতে গবেষণা এলাকায় তেমন কোন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি না

করেই সরাসরি সেখানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সাধারণতঃ, যেখানে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মতো দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার সময় ও সুযোগ কম, সেখানে এই পদ্ধতি বেশ উপযোগী। প্রধানতঃ, কৃষি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণায় এই পদ্ধতির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হয়। এ পদ্ধতিতে সকল প্রস্তুতি (যেমন, এলাকা নির্ধারণ, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তিবৃন্দের নির্বাচন, চেকলিষ্ট তৈরি, ইত্যাদি) সম্পন্ন করে গবেষণা এলাকায় যাওয়া হয়। জনগণের সাহায্য নিয়ে গ্রামের দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে জেনে নেয়া এবং গবেষণা এলাকায় একটি মানচিত্র তৈরি করা অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রধান গবেষক গ্রামবাসীদের নিয়ে দলীয় আলোচনার আয়োজন করেন এবং গ্রামের ইতিহাসের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখপূর্বক সেই গ্রামের শক্তি ও দূর্বলতা সম্বলিত একটি পটভূমি তৈরির জন্য অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন। তিনি শ্রেণীভিত্তিক বিভিন্ন খানা (household) চিহ্নিত করেন। অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও নির্বাচিত দল আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Participatory Rural Assessment): তবে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ পদ্ধতিতে গবেষক স্বল্প সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান চালান বলে জনগণের সামস্যার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে, তা অনেক সময় অসম্পূর্ণ গবেষণায় পরিণত হয়। দলগত আলোচনার বেলায়, জনগণের মধ্যে সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় ঐকমত্যে পৌঁছানো বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, একেকটি দল একেকটি বিষয়কে বেশী অগ্রাধিকার দিতে চান। এ ধরণের গবেষণা স্থানীয় দু'একটি গ্রাম, বাজার বা ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিচালনা করা হয় বলে এ গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল দিয়ে সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ থাকে কম। অনেক সময় এ পদ্ধতিতে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রধান্য দেখা যায়। দলীয় আলোচনাতেও এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রধান অংশগ্রহণ গবেষণার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। ফলে, এ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র বা দুর্বল শ্রেণীর মতামত প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নে জনগণের মতামতের উপর গুরুত্ব দেয়া হলেও এবং জনগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও প্রতিবেদন তৈরির সময় গবেষকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ প্রয়োগের প্রবণতার ফলে সুপারিশসমূহের মধ্যে জনগণ অপেক্ষা গবেষকের মূল্যায়ন বা মতামতের প্রতিফলন ঘটে বেশী। সে কারণে, অনেক সমালোচক অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন জনগণের মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন বলে স্বীকার করতে চান না।

মূল্যায়ন গবেষণা (Evaluation Research)

মূল্যায়ন গবেষণা এমন এক ধরণের গবেষণা নক্শা, যা মধ্যবর্তী কর্মসূচীর পরিকল্পনা, নতুন ও বিদ্যমান কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও এর কার্যকরকরণকে তদারকী করা এবং কিভাবে একটি কর্মসূচী কার্যকরভাবে তার লক্ষ্য অর্জন করে তা নির্ধারণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

মূল্যায়ন গবেষণা এমন এক ধরণের গবেষণা নক্শা, যা মধ্যবর্তী কর্মসূচীর (intervention programme) পরিকল্পনা, নতুন ও বিদ্যমান কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও এর কার্যকরকরণকে তদারকী করা এবং কিভাবে একটি কর্মসূচী কার্যকরভাবে তার লক্ষ্য অর্জন করে তা নির্ধারণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। যদিও মূল্যায়ন গবেষণা বহু বছর ধরে চর্চা হয়ে আসছে কিন্তু সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে সরকারী ও বেসরকারী উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থায়নের ফলে এর প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে কেবল সাম্প্রতিককালে। যারা অর্থায়ন করেন তারা দেখতে চান যে, গৃহীত কর্মসূচীগুলো তাদের লক্ষ্য অর্জন করছে কি না, কতটুকু কার্যকরভাবে তা করছে এবং সেগুলো কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্ম দিচ্ছে কি না। অর্থাৎ, মূল্যায়ন গবেষণা হলো এ সকল প্রসঙ্গ সম্পর্কে যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ ও সরবরাহের একটি উপায়। যেমন সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর জানতে চাইতে পারে যে, বয়স্ক মানুষদের জন্য বয়স্ক ভাতা প্রদানের পাশাপাশি সেবা প্রদানকারী নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে কি না। মূল্যায়নের পর যদি এ ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তখন পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হয় যে, বয়স্ক মানুষদের কাছে কার্যকরভাবে সেই সেবা পৌঁছাচ্ছে কি না। একটি আদর্শ মূল্যায়ন গবেষণায় সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা, পর্যবেক্ষণ, বিদ্যমান উপাত্তের বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষণকে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করা যায়।

সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, মূল্যায়ন গবেষণা প্রধানতঃ তিনটি কারণে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে। যেমন, দাতা সংস্থার শর্ত পূরণের জন্য, সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদানের মান

উন্নয়নের জন্য, অথবা সেবা প্রদানমূলক কর্মসূচীর দক্ষতা ও কার্যকারীতা বৃদ্ধির জন্য। এ ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যটি হলো, একটি কর্মসূচী পরিচালনার দক্ষ ও কার্যকর উপায় বের করা। দ্বিতীয়তঃ, প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে। যেমন, একটি কর্মসূচী কি প্রভাব ফেলছে তা দেখার জন্য মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে, কর্মসূচীর লক্ষ্যগুলো চিহ্নিত করা থাকে এবং সে সকল লক্ষ্যের বিপরীতে কর্মসূচীকে পরিমাপ করে দেখা হয় যে, সে লক্ষ্যগুলো যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে কি না। মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসূচীকে প্রসার, পরিবর্তন বা স্থগিত করার প্রয়োজন রয়েছে কি না সে সম্পর্কে নীতিমালা তৈরি হয়। তৃতীয়তঃ, অনুকল্প পরীক্ষা বা প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে। এ ধরণের মূল্যায়ন একটি বিশেষ প্রায়োগিক কর্মসূচী সম্পর্কে শুধুমাত্র তথ্যই প্রদান করে না, সামাজিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভান্ডারকে সম্বৃদ্ধও করে, যা নতুন কর্মসূচী প্রণয়নে উপযোগী হতে পারে।

মূল্যায়ন গবেষণার ধরণ (Types of Evaluation Research): গবেষণার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন গবেষণাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় — গঠনাত্মক মূল্যায়ন গবেষণা (formative evaluation research) ও সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন গবেষণা (summative evaluation research)। গঠনাত্মক মূল্যায়ন গবেষণা একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বিকাশ এবং বাস্তবায়নকে নির্দেশনার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহের উপর কেন্দ্রীভূত থাকে। এটি প্রধানতঃ, একটি কর্মসূচীকে সুসমন্বিত ও সুচারুরূপে পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন গবেষণা কর্মসূচীর প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্যটি কেন্দ্রীভূত থাকে কর্মসূচীর কার্যকারীতার মূল্যায়ন এবং প্রকল্পের ফলাফল অন্যান্য প্রেক্ষাপটে কি মাত্রায় সাধারণীকরণ করা যায় তার উপর। গঠনাত্মক মূল্যায়ন গবেষণা সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন গবেষণার তুলনায় কম দৃষ্টি আর্কষণ করতে সক্ষম হলেও এ দু'টি প্রকরণ একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। গঠনাত্মক মূল্যায়ন সতর্কতার সাথে পরিচালনা না করলে সমষ্ঠিমূলক মূল্যায়ন পরিচালনা এবং এর ফলে মানসম্পন্ন ফলাফল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

মূল্যায়ন গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Evaluation Research): আমরা জেনেছি যে, মূল্যায়ন গবেষণা নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া, সেবা প্রদানের উন্নয়ন, তত্ত্ব পরীক্ষা ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির পরীক্ষা পরিচালনায় সহায়তা করে। এর অন্তর্নিহিত ধারণাটি হলো যে, এ ধরণের গবেষণার ফলাফলকে বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার করা। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে কার্যতঃ সবসময় তা ঘটে না। *প্রথমতঃ*, ভ্রান্ত নক্শা বা ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়নের কারণে মূল্যায়নের ত্রুটি ঘটে থাকে এবং এর ফলে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায় না। *দ্বিতীয়তঃ*, মূল্যায়কের দুর্বল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মূল্যায়নের ফলাফলের প্রয়োগ তেমন কার্যকরী হয় না। *তৃতীয়তঃ*, গবেষণার ফলাফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন গবেষকের ব্যর্থতা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। *চতুর্থতঃ*, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি বিশেষ মহলের বাধা প্রদান মূল্যায়ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহারকে অসম্ভব করে তোলে। এ সকল সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার কৌশল হিসাবে মূল্যায়ন গবেষণার ফলাফলকে যত বেশী বিতরণ ও প্রচার করা সম্ভব তা করতে হবে এবং ফলাফলকে যত বেশী সম্ভব ব্যবহারের জন্য জনসমক্ষে উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে করে সেবা গ্রহীতারা ফলাফল সম্পর্কে বেশী করে অবহিত হতে পারেন।

সারাংশ

গত তিনটি পাঠে অধিক প্রচলিত গবেষণা নক্শা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান পাঠে প্রচলিত গবেষণা নক্শার বাইরে যে সব নক্শা ব্যবহৃত হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত গবেষণা নক্শার বাইরে যে সব গবেষণা নক্শা বেশী ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো 'সংহত দল আলোচনা', 'দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন', 'অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন' এবং 'মূল্যায়ন গবেষণা' । মূল্যায়ন গবেষণা ছাড়া অন্যান্য গবেষণায় গুণগত তথ্যের সমাহার থাকে বেশী। সাধারণতঃ, কোন বিষয় বা সমস্যা অধ্যয়নে প্রচলিত কৌশলগুলো যদি পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহে যথাযথ না হয়, তখন উপরিল্লিখিত কৌশলগুলো সহায়ক ফল বয়ে আনে। বস্তুতঃ, গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন ধরণের কৌশল যথাযথ ফল দিবে।

সে বিষয়ে এবং সেই আলোকে গবেষক গবেষণা নক্শা তৈরি করেন। একটি ভালো গবেষণা নক্শাই ভালো গবেষণা ফল জন্ম দিতে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। এফ জি ডি প্রথম ব্যবহার করেন:

ক. E. Bogardus
খ. L. Guttman
গ. Kurt Lewin
ঘ. R. Likert।

২। এফ জি ডি'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

ক. দলকে বিশ্লেষণ করা
খ. দলের সদস্যদের মধ্য থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা
গ. দলের সাথে দলের তথ্যের ভিত্তিতে তুলনা করা
ঘ. দল গঠনে সহায়তা করা।

৩। যে তিনটি কারণে মূল্যায়ন গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে সেগুলো হলো:

ক. প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য/প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে/অনুকল্প পরীক্ষার উদ্দেশ্যে
খ. প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য/প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে/অর্থ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে
গ. প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য/সময় বাঁচানোর উদ্দেশ্যে/প্রভাব মূলায়নের উদ্দেশ্যে
ঘ. প্রভাব মূলায়নের উদ্দেশ্যে/সময় বাঁচানোর উদ্দেশ্যে/ অনুকল্প পরীক্ষার উদ্দেশ্যে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সংহত দল আলোচনা কী?

২। মূল্যায়ন গবেষণা কেন করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের গ্রাম গবেষণায় 'সংহত দল আলোচনা'র ভূমিকা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।